অজপা-কল্পতরু

বা

"এক বিন্দু কৃপা"

শ্রীগোবিনচাঁদ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

৫১ ডি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট

ভবানীপুর, কলিকাতা

৫ই আষাঢ় ১৩৩৫।

কলিকাতা ১৬৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
চেরি প্রেস লিঃ হইতে
আর, কে রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ শ্রীসদ্‌গুরবে নমঃ ॥

মন্নাথো শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরু ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আহা কি চাঁদিনী রাতি, অপূর্ব্ব হয়েছে জ্যোতি,
অপূর্ব্ব মন্দিরে একি অপূর্ব্ব উদয় ।
এস হে জগদ্‌গুরু, বরি তোমায় কল্পতরু
গুরু অপূর্ব্বের মাঝে যাহার আলয় ॥
(তব) দরশ পরশ লাগি, সতত করুণা মাগি
কত জন্মান্তর প্রভু করেছি ভ্রমণ !
ভাবি নাই ভক্ত প্রাণ, পুরাইতে মনস্কাম
অপূর্ব্ব মন্দিরে এসে দিবে দরশন ॥
যদি আবির্ভাবে হে বাঞ্ছিত, জুড়ালে তাপিত চিত
তিলেক দাঁড়াও পূজি যুগল চরণ ।
যাচি প্রভু দয়াময়, (যেন) প্রেমানন্দে এ হৃদয়
বিশ্বাস ভকতি বদ্ধ রহে অনুক্ষণ ॥
হেন গুরু নাহি হয়, হবে না হবার নয়,
সার্থক জনম হেন আশ্রয় যাহার ।
নমি গুরু অপূর্ব্বেন্দ্র, নির্ম্মল প্রেমের কেন্দ্র
সদ্‌গুরু কৃপা লাভ দয়ায় তোমার ॥

শ্রীগুরু চরণাশ্রিতা হেমন্ত-শোভা ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

নিবেদন

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।

গী ১৫।২০

অতি গোপনীয় এই শাস্ত্র সুনির্ম্মল
সংক্ষেপে তোমারে আমি কহিনু কেবল॥
অর্জ্জুন যে কোন জন জীবনে তাহার
এ তত্ত্বের মর্ম্ম যদি পায় একবার॥
দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী হয় চরিতার্থ মন
কৃতার্থ হইয়া যায় সার্থক জীবন॥

যাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে,—যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং কল্পান্তে যাঁহাতে উপসংহৃত হইবে, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা বিন্ধ্যাদিনিলয়া মহামায়ার কৃপায় তদীয় কৃপালব্ধ "অজপা-কল্পতরু" বা "এক বিন্দু কৃপা" নামক পুস্তক অদ্য ভক্তনারায়ন-গণের চরণে পরমাদরে অর্পণ করিলাম।

এই পুস্তকে ব্রহ্মময়ী মার আদেশে যাহা তিনি লিখাইলেন তাহাই লিখিলাম। এই পুস্তক যে কখনও ছাপান হইবে তাহা আমি ভাবি

নাই যে হেতু শাস্ত্র ও মহাজন ব্রহ্মবিদ্যাকে অত্যন্ত গোপনে রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। যাহা হউক রামকুটীর সন্তানগণের প্রার্থনায় ও সদ্‌গুরুর আদেশে ইহা প্রকাশিত হইল।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যে শব্দ (ইষ্টমন্ত্র) সর্ব্বদা অজ্ঞানতঃ হইতেছে তাহার উপর লক্ষ্য রাখার নাম "অজপা" জপ। এই অজপাকে শাস্ত্রে "ব্রহ্মবিদ্যা" বলিয়া থাকেন—ইহাতে মুক্তিও করতলগত হয় ও শান্তি পাওয়া যায়। ইহার সাধনে (অভ্যাসে) "অহরহঃ উপলব্ধি" ও "কৃষ্ণপ্রেম" বা "কৃপা লাভ" হয়। অজপা জপে, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই অজপাতে কর্ম্মফল পর্য্যন্ত খণ্ডন হয়। অজপা সর্ব্ব পাপহর, সর্ব্বব্যাধিহর, এমন কি যক্ষ্মা রোগ, দুরারোগ্য জ্বর, হাঁপানি, অর্শ প্রভৃতি ব্যাধি অজপা ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে সুস্থ হইতেই হইবে। ইহা ভাষার ঝঙ্কার মাত্র নহে। জন্মের সহিত এই শ্বাসকে পাওয়া যায় এই জন্য ইহার সাধনকে শাস্ত্র "সহজ সাধন" বলিয়া থাকেন। মনঃস্থির না হইলে কেহই "আত্মদর্শন" বা "কৃষ্ণঃপ্রেম" লাভ করিতে পারেন না। অতএব মানুষের সকল মঙ্গলের মূল চিত্ত-নিরোধ। মন বশীভূত করারই নামান্তর চিত্ত-নিরোধ, চিত্ত-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মহাজন ও শাস্ত্র বলেন যে মনকে জয় করিতে হইলে কলিযুগে "নামই" প্রধান অস্ত্র। গুরুবাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক ভক্তগণ সহ "নাম" করিলে সঞ্চিত কর্ম্ম সকল খণ্ডন হয়—ভবপারে যাইবার একমাত্র উপায় "নাম"। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক বৈরাগ্য ও অভ্যাস অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা সেই অখণ্ড চৈতন্যের নাম করিতে করিতে জীব যে ভবসমুদ্র পার হইয়া নামীর নিকট পৌছিয়া যাইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই বলি ভক্তগণ, সাধকগণ অবিরাম

'নাম" কর। সময় পাইলেই ভক্তগণসহ "নাম' কর অহরহঃ নাম করিতে হইলে অজপা জপই (যাহা জপিবার নহে অর্থাৎ অনায়াসে স্বভাবতঃ জপ হইতেছে) প্রশস্ত।

অজপা সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াও আমার সাধ মিটে নাই। তজ্জন্য মনে হয় আমার ব্রহ্মময়ী মা জগতের কল্যাণার্থে ও সাধক পাঠকের হিতার্থে বুঝি এমন একটী কথা (অজপা সম্বন্ধে) এই কাঙ্গাল দ্বারা বলাইবেন যেটী শুনিলে সাধক পাঠক অজপা অভ্যাস করিবেন, তাই আশা এতদিনে মিটে নাই। কিন্তু অধুনা মার আদেশে ভক্তনারায়ণগণ ইহা প্রকাশ করিলেন। মার কৃপায় কিনা হয়! তাঁর এক বিন্দু কৃপা পাইলে ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব ধন্য হইয়া যায়। তিনি একবার কৃপা কটাক্ষ করিলে

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"।

বোবাতেও গীত গায়, খঞ্জ পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ হয়। এই একবিন্দু কৃপা, উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় ব্রহ্মময়ীর করুণা, হৃদয়ে ধারণ করিবার একমাত্র কৌশল অজপার লক্ষ্য করা। সুতরাং এই বিদ্যারই আমরা শরণ লইলাম।

যে গূঢ় রহস্য মা আজ অকপটে বড় আদরের সন্তানগণের সম্মুখে ধরিলেন দেখিও তাহা যেন অনাদৃত উপেক্ষিত, ও বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত না হয়। মা জগদম্বিকে, আমার এই লেখায় ও এই চেষ্টায়—এই পঙ্কে—যদি মা পঙ্কজিনী তুমি না প্রস্ফুটিত হও; তবে সবই বৃথা!

মা ব্রহ্মময়ী, জগজ্জননী আমার, তোমার শ্রীচরণে করুণ ক্রন্দন সহ কাতর প্রার্থনা যেন তুমি ভক্তিমান পাঠকের, সাধকের, ভক্তগণের

হৃদয় সরোবরে অজপা রূপে জ্ঞানতঃ প্রস্ফুটিত থাকিও। যদি একটীও ভক্ত আমার এই মায়ের বাণী পাঠ করিয়া অজপা সাধন অভ্যাস করেন ও অহরহঃ প্রত্যক্ষ দর্শন পান তবেই আমার লেখা সার্থক মনে করিব।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এইটী সংসারী সকলের কাছে বড়ই ভরসার কথা। যুগে যুগে প্রয়োজন হইলে তিনি আসেন। কখনও বেদ রূপে, কখনও রাম রূপে, কখনও কৃষ্ণ রূপে কখনও বা তন্ত্র শাস্ত্র রূপে। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে এই ব্রহ্মবিদ্যা রূপেই এবার তিনি প্রকাশ হইয়াছেন।

আমি গুরুকৃপাতে বুঝিয়াছি যে বিনা প্রেমে নন্দলালাকে মেলে না। আমার কৃষ্ণ প্রেমের গন্ধও নাই তথাপি কি জানি কেন কৃষ্ণনাম ভালবাসি—কৃষ্ণ রূপ ভালবাসি—শ্বাসে শ্বাসে রাধাকৃষ্ণ জপ ভালবাসি। ভালবাসা যোগ্যতা-অযোগ্যতার অপেক্ষা করে না তাই আমি লেখক না হইয়াও "একবিন্দু কৃপা" বা "অজপা—কল্পতরু" ভক্তনারায়নগণের চরণে দিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

সুতরাং ভালই হউক, মন্দই হউক আমি অজপা প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট ; মানব- মুখে নিন্দার ভয় বা যশের আশা অতি অল্পই রাখি।

পরিশেষে আর একটী কথা আমার পরম স্নেহ ভাজন ভক্ত শ্রীমান সুধীর কুমার সিংহ সদ্‌গুরুর আদেশে এই পুস্তক সঙ্কলনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি পুস্তকের প্রকাশকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাহার প্রতিদান নাই।

অজপা-কল্পতরু :

এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা বা আশা আমার ছিল না? কিন্তু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে ও সদ্‌গুরু আদেশে পরম ভক্ত বদান্যবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঘোষ এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। যে মঙ্গলময় মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে এইরূপ সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন, আমার আশীর্ব্বাদ বাহুল্য মাত্র। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে যদিও শ্রীশ্রীরামকুটীর সন্তানগণের কল্যানেই আমার এই শুভ উদ্যম সফল হইল, তথাপি আমার পুত্রকল্প প্রিয়তম শিষ্যগণের সর্ব্বতোমুখ প্রযত্ন ব্যতিরেকে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। তাঁহাদের প্রতি নৈমিত্তিক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমি তাঁহাদের নিত্যাশীর্ব্বাদক।

ওঁ তৎসৎ গুরু ওঁ॥

ভবানীপুর—রামকুটীর
৫ই আষাঢ়
১৩৩৫ সাল।

ভক্তপদারবিন্দ ভিক্ষু
দীন শ্রীঅপূর্ব্বেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(সচ্চিদানন্দ স্বামী)

উৎসর্গ।

ভক্তনারায়নগণের চরণ প্রান্তে নিবেদন—

আপনারা যে অধমকে এত ভালবাসেন তাহা আপনাদেরই বিশ্ব প্রেমিকতার পরিচয়। আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। এজন্য হে ভক্তনারায়ণগণ আপনাদের সঙ্গলাভের বাসনা সর্ব্বদা হয় কিন্তু শ্রীগুরুর ইচ্ছায় উহা কোথায় পর্য্যবসিত হইবে তাহা তিনিই জানেন। আপনাদের চুম্বকাকর্ষণ সর্ব্বদাই অনুভব করি। আপনারা সকলেই এক একটী চুম্বক বিশেষ। তাহা না হইবেই বা কেন? প্রকাণ্ড চুম্বকের সহবাসে অতি হীন প্রস্তরও চুম্বকগুণ লাভ করে,-আপনারা ত মার্জ্জিত প্রস্তর। যাহা হউক, আপনাদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও যে আপনাদের আনন্দ উৎসের অংশ পাইয়া ধন্য হইতেছি, ইহা শ্রীগুরু-কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "তিনি অনন্ত দয়াল খনি", তিনি দয়াময় না হইলে মাদৃশ অধমজনের উপায় কি হইত? তিনি কৃপা দৃষ্টিতে না চাহিলে এরূপ বদ্ধ-জীবগণের চক্ষু কি ফুটিত? তিনি ধরা না দিলে কে তাঁহাকে চিনিত?

ঘোর অন্ধকারময়, কৃমি-বিষ্ঠা পরিপূর্ণ জঘন্য এই সংসার মায়ায় বদ্ধ জীব যখন প্রথম অতি দূরে স্বর্গীয় ক্ষীণ আলোক রেখা দর্শন করে তখন তাহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়। তখন শ্রীগুরুর অযাচিত অহৈতুকী কৃপার প্রথম পরিচয় পাইয়া মস্তক স্বতঃই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লুণ্ঠিত হয়। এ সংসারে "সৎলোক" বা "অসৎলোক—"সাধু" বা "অসাধু" কে তাহাত বুঝিতে পারি না।

যে ভাগ্যবান্ তাঁহার কৃপাকর্ষণে সমর্থ হয় সেই "সৎ" বা "সাধু" হইয়া যায়। শক্তিমান যখন সংকল্প করেন "এ বালক আমার চিরানন্দময় বা চিদানন্দময় অমৃত পূর্ণ পথের অনুসরণ করুক" তখন তাহার সাধ্য কি যে সে বিপথে যায়।

মহাপুরুষগণের হৃদয় :—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি কোমলং কুসুমাদপি"।

যিনি সাংসারিক সমস্ত আকর্ষণের অতীত তাঁহার কৃপাকর্ষণের উপায় অতি কঠিন। আছে—কেবল একটী মাত্র ব্রহ্মাস্ত্র—উহা "ভক্তি"। অকপট-ভক্তি-রূপ ব্রহ্মাস্ত্র তাঁহার "কোমল-কঠিন" হৃদয় ভেদ করিয়া অন্তঃস্তল স্পর্শ করিতে সমর্থ। প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ দুর্য্যোধন তাঁহাকে বাঁধিতে পারেন নাই, তিনি ভক্তিডোরে অর্জ্জুনের দ্বারে আবদ্ধ হইয়া সানন্দে তাঁহার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌরবগণের অতুল বৈভব ও অস্ত্রবল যে কার্য্য করিতে অক্ষম, গোপীগণের ও রাখাল বালকগণের অশ্রুজল সে কার্য্য সাধন করিয়াছিল। মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। যতদিন আমরা মনোবাসনা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিয়া গোপীগণের ন্যায় আমাদের যথা সর্ব্বস্ব এমন কি মন প্রাণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে না পারিব ততদিন আমরা সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া অজ্ঞান তিমিরে ঘুরিয়া বেড়াইব।

শ্রীভগবানই এ কথা বলিয়াছেন :—

"প্রজাহতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
"আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট স্থিত প্রজ্ঞস্ত দোচ্যতে॥

গীতা ২। ৫৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ, পরমানন্দরূপ আত্মাতেই (অন্য বিষয়ে নহে) স্বয়ং পরিতুষ্ট হইয়া অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া যখন যোগী মনোগত সর্ব্ববিধ বিষয়াভিলাষ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।

অতএব হে ভক্তনারায়ণগণ,—আপনারা সকলে আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া যিনি সর্ব্বকর্ত্তারূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত, যিনি ইঙ্গিত মাত্র দ্বারা আমাদের ভক্তিভাব জাগরিত করিতেছেন, যিনি লীলাময় হইয়া সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বদা চালক-স্বরূপে এই অন্ধ কূপ (সংসার) মধ্যে আমাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আমাদের উৎসাহ দিয়া পথ দেখাইতেছেন, বিভীষিকা দর্শনে যিনি 'মা ভৈঃ" শব্দে অভয় দিয়া অসীম বল ও সাহস দিতেছেন, যিনি গুরু-রূপে শান্তি দিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা "অজপা" অহরহঃ অভ্যাস ও লক্ষ্য করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন সেই দীন 'দয়াময়, অনাথনাথ কাঙালের হরির শ্রীচরণে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

হে গোপীজনবল্লভ, প্রাণবল্লভ হে, ভক্ত তোমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু এবং তুমি তাঁহাদিগকে নিজের অপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়া থাক, তজ্জন্য ভক্তের পূজাতেই তোমার পূজা হয় জানিয়া এই ক্ষুদ্র উপহার ভক্তচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য হইলাম। তোমার ভক্তনারায়ণগণ জয়যুক্ত হউন। তাঁহাদের চরণে কোটী কোটী প্রণাম। অলমতি বিস্তরেন।

ভক্তচরণাশ্রিত
দীনাতিদীন
শ্রীঅপূর্ব্বেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।



শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামী

অজপা-কল্পতরু

বা

"এক বিন্দু কৃপা"



পথ কি ?

"সং পুষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ ।
সক্ষ্বা দেব প্রণস্পুর ॥
যো নঃ পুষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি
অপ স্ম তং পথো জহি ॥"

ঋগ্বেদ, ১ম—৪৩ সূঃ ।

হে ভগবন্

যে মন্ত্রে ঋষিগণ আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রেই আহ্বান করিতেছি। হে জগজ্জীবন, জ্যোতির্ম্ময়, বিঘ্ন বিনাশ করুন ; গন্তব্য-পথ প্রদর্শন করুন ; আমাদের নেতৃরূপে পথ-প্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হউন।

ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ যদি শান্তি চাও
সৎসঙ্গে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে জীবন কাটাও ॥

মনুষ্য অহরহঃ একটী বস্তুর অনুসন্ধানে ফিরিতেছে। দুগ্ধপোষ্য বালক সেও সেই সামগ্রী খুঁজিতেছে। আসন্ন মৃত্যু শয্যাশায়ী শতাধিক বয়স্ক বৃদ্ধও সেই সামগ্রী খুঁজিতেছেন। সংসারে যে ব্যক্তি কোনও কার্য্য করিতেছে, সকলেই সেই সামগ্রী লাভের আশায় প্রণোদিত। কেবল মনুষ্যই বা বলি কেন, বিশ্বচরাচরে প্রাণিমাত্রেই প্রতিনিয়ত সেই সামগ্রীর সন্ধানে ছুটিতেছে।

সংসারের সকলে যাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, যে সামগ্রীর প্রতি সকলেরই সমান অনুরাগ, সে এমন কি সামগ্রী ? স্রষ্টার সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে; ঈশ্বরের অস্তিত্বেও কেহ বা বিশ্বাসবান, কেহ বা সন্দিহান। কিন্তু এমন বস্তু কি থাকিতে পারে, সকলে যাহার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট—সকলেই যাহাকে সর্ব্বদা খুঁজিতেছে।

সুখান্বেষণ—

সেই সামগ্রীকে সুখ, আনন্দ বা শান্তি বলিতে পারি। সুখ, আনন্দ বা শান্তি চায় না সংসারে এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল, মুহূর্ত্তমধ্যে যাহাকে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতে হইবে সেই ব্যক্তিও এক কণা শান্তির ভিখারী। যে আত্মহত্যা করে, তাহারও বিশ্বাস মরণেই তাহার শান্তি। মানুষের কর্ম্মমাত্রই সুখ-সাধনে নিয়োজিত। যোগ-পরায়ণ যোগী এক মনে, এক ধ্যানে যোগাসনে বসিয়া আছেন, দেহের উপর বালীর স্তূপ জন্মিল, তাহার উপর বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হইল—তথাপি তাঁহার যোগভঙ্গ হইল না। তাঁহার এই যোগ সাধনা সুখের জন্য—আনন্দের জন্য নহে কি? সৎকার্য্য অসৎকার্য্য সকল কার্য্যেরই মূল লক্ষ্য—সুখ সাধন। সুখের বা আনন্দের নানান্তর, নানা পর্য্যায় থাকিতে পারে, কিন্তু মূল সুখান্বেষণ ভিন্ন কর্ম্মের লক্ষ্য অন্য কিছুই হইতে পারে না। দাতার দান

ধর্ম্মে যে আত্মপ্রসাদ লাভ, তাহা সুখেরই একটী অঙ্গবিশেষ। হিন্দু দোল—দুর্গোৎসব পূজা পার্ব্বণ করেন, সেও আনন্দের জন্য। দস্যু দস্যুবৃত্তি করে, নরহন্তা নরহত্যা করে, প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনা করে, বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহাদেরও মূল লক্ষ্য—সুখ সাধন। সুখের জন্য সংসার পাগল হইয়া আছে। যাহার যেরূপ জ্ঞান বুদ্ধি, যাহার যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা সে সেইরূপ ভাবেই সুখের অন্বেষণে ফিরিতেছে। *

পথ কি ?

নানা লোকে নানা পথে সুখান্বেষণে প্রধাবিত। কিন্তু পথ বড়ই কুটিল, বড়ই পিচ্ছিল। সে পথে অগ্রসর হইতে যাইয়া কেহ বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া বিপথে পড়িতেছেন, কেহ বা অগ্রসর হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া বিড়ম্বিত হইতেছেন। অধিকাংশেরই এই অবস্থা,—তবে কি কেহ সে পথ অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না ? যাঁহারা শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলিয়াছেন, যাঁহারা মহাজনগণের অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন যাঁহারা বিবেক বুদ্ধির অনুসারী হইয়াছেন, তাঁহারাই পারিয়াছেন। শাস্ত্র

---

* অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাঙ্মুখাঃ।
এবমন্যে তু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতং॥
নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথাপরে।
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ সুযুক্ত্যা স্থিতিকাতরা॥ শিবসংহিতা ১৩।১৪

এই সকল বিদ্বানের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কেহ বা করেন না। বস্তুতঃ ইঁহারা প্রকৃত তত্ত্বপথে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া স্বীয় স্বীয় যুক্তিবলে নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ফলকথা, ইঁহাদের মত পরস্পর অতীব প্রভিন্ন; ইঁহারা পরমার্থমার্গ হইতে একেবারেই বিমুখ; ইঁহারা যেমন উপদেশ পাইয়াছেন এবং ইঁহাদের যেমন বুদ্ধি, তদনুসারে ভাবনা করিয়া ইঁহারা সেশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ স্থির করিয়াছেন।

সেই পথ দেখাইবার জন্য আলোক বর্ত্তিকা ধরিয়া আছেন, মহাজনগণ সেই পথ দেখাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন, আর বিবেকবাণী সেই পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রতিনিয়ত উপদেশ দিতেছেন। শাস্ত্রাদিতে দুঃখ নিবৃত্তির যে উপদেশাবলী, তাহার উদ্দেশ্য চরম সুখলাভ। এই সুখলাভের পথ হিন্দুর শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি কি বিশদভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রাদির মূল লক্ষ্যই সেই পথ প্রদর্শন।

ভক্তি ও কর্ম্ম—

মনুষ্যের প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন প্রকার, তাহার শিক্ষা যেরূপ বিভিন্ন প্রকার,—সুখলাভের পথও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী প্রশস্ত সরল পথের নাম—"বিশ্বাস ভক্তি।" সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণেও, সচরাচর দেখিতে পাই, শেষ জীবনে ভক্তির উদয় হয়। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন :—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১০

অর্থাৎ "নিষ্কামই হউন অথবা সর্ব্বপ্রকার কামনা যুক্তই হউন, মুক্তিপ্রার্থী, উদার বুদ্ধি ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহযোগে পরম পুরুষের উপাসনা করিবে।" দুঃখ নিবৃত্তিরই নামান্তর মুক্তি বা কৈবল্যপ্রাপ্তি। সেই অবস্থাই চরম সুখের অবস্থা। শাস্ত্র উপদেশ দিলেন, সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম যেরূপ ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, ভগবানের প্রতি ভক্তি

রাখিয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তি অবশ্যই লাভ হয়। মূলে ভক্তি প্রয়োজন। ভক্তিশাস্ত্র ভক্তির নিকট জ্ঞানের গৌরব খর্ব্ব করিয়াছেন। যে জ্ঞান ভক্তিবিহীন সে জ্ঞান ফলোদায়ক নহে। ভক্তিই মুক্তির প্রশস্ত পথ? কিন্তু ভক্তিও তো বিভ্রান্ত হইতে পারে। এই স্থানেই কর্ম্মের কথা উঠে। মানুষ সৎকর্ম্ম করিবার সময়ও ভক্তিমান্ হইতে পারে; আবার অসৎকর্ম্ম করিবার সময়ও ভক্তিমান হইতে পারে। যথা, দস্যু দস্যুবৃত্তি করিতে চলিয়াছে, ভক্তিভরে নৃমুণ্ডমালিনীর নিকট সাফল্য কামনা করিতেছে। সেই ক্ষেত্রে ঐরূপ ভক্তিতে কি ফললাভ হইবে, সহজ বুদ্ধিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। আবার আর এক জন ভীষণ ভয়ে ভীত হইয়া, বা যন্ত্রণা ও কষ্টদায়ক অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কাতরকণ্ঠে বিপদ্‌বারণ ভগবানের করুণাপ্রার্থী হইয়া ডাকিতেছেন—"ভগবান্! তুমি রক্ষা কর।" এখানে ভক্তির মাহাত্ম্য অক্ষরূপ। মানুষ অনেক সময় কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারে না। তাই বিভ্রমগ্রস্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"কিম্ কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।"

কর্ম্ম কি, অকর্ম্মই বা কি তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতগণও মুহ্যমান্ হন।

সৎসঙ্গ—

এখন কি করা যায়? শাস্ত্র এই অবস্থায় উপদেশ দিতেছেন, "সৎসঙ্গ কর। সৎসঙ্গের মহিমা অসীম। ওজন করিলে এক পার্শ্বে স্বর্গ ও মুক্তি, অন্য পার্শ্বে ক্ষণমাত্র সৎসঙ্গের তুলনা হইতে পারে। অনাদি দুঃখপ্রদ এই সংসার নিবৃত্তির প্রথম উপায় "সৎসঙ্গ"। কর্ম্মফল

খণ্ডন করিতে হইলে "সাধুসঙ্গ" বা "সৎসঙ্গ" করিতেই হইবে। সৎসঙ্গে জীব চির অমরত্ব লাভ করে। সাধুসঙ্গ বিনা "বিশ্বাস" পর্য্যন্ত লাভ হয় না। যিনি সম্মানিত হইলেও হৃষ্ট হন না, অপমানিত হইয়াও ক্রোধ করেন না, এবং ক্রুদ্ধ হইলেও রূঢ়বাক্য বলেন না, তিনিই প্রকৃত সাধু—শাস্ত্র তাঁহাদের সঙ্গকেই "সাধুসঙ্গ" বলেন। অজপা লক্ষ্যই প্রকৃত "সাধুসঙ্গ" বা সৎসঙ্গ। "সৎ" অর্থে সদা বিদ্যমান তার সঙ্গ করা অর্থাৎ লক্ষ্য করা, শ্বাস প্রশ্বাসকে লক্ষ্য করার নামই "সৎসঙ্গ"। সৎসঙ্গের সুফললাভের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে লোকের শীত অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সৎসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকা পর আশ্রয় সেইরূপ ভবসাগরে নিমজ্জন এবং উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধু সকল পরম আশ্রয়।

ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তের সাধনা—

ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা ও কর্ম্মাত্মিকা। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই একত্রে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তবেই ভক্তির উদয় হয় এবং মুক্তিলাভ হয়।

যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে :—

উভাভ্যামেব পক্ষ্যাভ্যাহ যথা খে পক্ষিণাংগতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥
কেবলাৎ কর্ম্মাণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে।
কিন্তু তাভ্যাংভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তূভয়ং বিদুঃ॥

যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষের দ্বারা উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ সাধকগণ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ উভয়াত্মক সাধন বলে বিষ্ণুর পরম পদের সন্ধান পায়। কেবল কর্ম্ম কিংবা কেবল জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং এতদুভয়াত্মক কর্ম্মই ভক্তির সাধনা।

শাস্ত্র এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত হন নাই। ইহার পর শাস্ত্র ভক্তির স্বরূপ তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শাস্ত্রমতে ভক্তি নববিধা। যথা,

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

ভক্তির নয়টী লক্ষণ দ্বারাই যে ভজন করিতে হইবে, তাহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। এক একটী অঙ্গ সাধনাতেও পুরুষার্থ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

(১) শ্রবন—শ্রীভগবাণের নাম, রূপ, গুণ পরিকর লীলাকাহিণী কর্ণপুটে গ্রহণ করার নাম শ্রবণ। যথা, পরীক্ষীৎ।

(২) কীর্ত্তন—উক্ত নাম, রূপাদি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণের নাম কীর্ত্তন। যথা, নারদ ও ব্যাসদেব।

(৩) স্মরণ=নামরূপাদি মনে মনে চিন্তনের নাম স্মরণ। যথা, যজ্ঞপত্নীগণ ও প্রহ্লাদ।

(৪) পাদসেবন—দেশকাল বিহিত পরিচর্য্যার নাম পাদসেবন। যথা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী।

(৫) অর্চনা—বিষ্ণুপূজা। যথা, কুব্জা ও পৃথু।

(৬) বন্দন—নমস্কার। যথা, উদ্ধব ও অক্রুর।

(৭) দাস্য—আমি ভগবানের দাস এই ভাব। যথা, হনুমান্।

(৮) সখ্য—বন্ধুভাবে শ্রীভগবানের হিতেচ্ছা। যথা, ব্রজের গোপবালকগণ, পাণ্ডব অর্জ্জুন।

(৯) আত্মনিবেদন—দেহাদি শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে অর্পণ। যথা, বলিরাজা সর্ব্বাত্মনিবেদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মলাভ করিয়াছিলেন।

এই নবলক্ষণা ভক্তি ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠানের নামই ভজন। ভক্তি শব্দ শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাচ্য। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পণের নামই ভজন। ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। যথা ভজ—ইত্যেষ বৈ ধাতুর সেবায়ং পরিকীর্ত্তিতঃ সুতরাং সেবনই ভক্তি। ভগবৎ পদে যে একান্ত রতি তাহারই নাম ভক্তি। গুরুকৃপা লাভ করিতে পারিলে "কৃষ্ণপ্রেম" উপলব্ধি হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি হইলে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। ভক্তিলাভ নিজ আয়াস সাধ্য নহে বটে, কিন্তু শরণাগতের প্রতি ভগবান্ দয়া করিয়া ভক্তি দান করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের নাম "ভক্তি"। ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য পরিতৃপ্তি পাইয়া অমৃতে পরিণত হয়। ভক্তি পাইলে মনুষ্যের তৃষ্ণা, শোক, দ্বেষ বিদূরিত হয় এবং কোনও বৃথা কার্য্যে উৎসাহ থাকে না। ভক্তি বিদিত হইলে মনুষ্য উন্মত্ত, স্তব্ধ ও আত্মারাম হইয়া যায়। অতএব সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন ভক্তিমেব সমাশ্রয়েৎ। ভক্তিই সার, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই ভূষণ ও ভক্তিই জীবন। ভগবৎমহিমা শ্রবণ করিতে করিতে কর্ণ

তন্ময় হইয়া যায়; কীর্ত্তন করিতে করিতে কণ্ঠ তন্ময়ত্ব লাভ করে। এইরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যখন তাঁহার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তখন আনন্দের অবধি থাকে না। তখন জলবিন্দুর মহাসাগরে মিলন ঘটে, কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া বন্ধুর পথে বক্রগতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া যে স্রোতস্বিনী মরুপথে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতে ছিল, শ্রাবণের প্লাবনে সে আপন গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—"যদি অনন্দ পাইতে চাও ভগবানে ভক্তিমান্ হও; যদি ভগবানে ভক্তিমান্ হইতে চাও, তাঁহার মহিমা শ্রবণ কর; তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর, তাঁহার ধ্যান ধারণায় তন্ময় হইয়া যাও।" এই সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা, ইহার নাম ভক্তি সাধনা। এই সাধনার ফলে মানুষ ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। প্রাণ যাহা চায়, তাহাই পায়। এই ভক্তি সাধনারূপ কল্পতরুমূলে সকল অভীষ্টই মিলিয়া থাকে। এই সাধনাই সত্য পথ।

ভক্তির উপায়—

ভক্তিপথের সাধকের পক্ষে ভক্তির উন্মেষের জন্য ব্যাকুলতা প্রথম প্রয়োজন। সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম গুণ গান কীর্ত্তন, সৎসঙ্গ, সর্ব্বদাই সদসৎবিচার ও মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়া তাঁহার চিন্তা করিতে হয়। এইগুলি ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে। মহাজনেরা বলিয়াছেন—"ধ্যান করিবে কোণে, বনে ও মনে।"

খুব ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলে অবশ্যই ঈশ্বর দর্শন হয়। আমরা স্ত্রী পুত্রের জন্য খুব কাঁদিতে পারি, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঈশ্বরের জন্য অনেকেই তেমন কাঁদে না। তজ্জন্যই ঈশ্বরদর্শন হয় না। ব্যাকুলতা হইলেই অরুণের উদয় হইবে। তা'রপর

সূর্য্য দেখা দিবেন ; ব্যকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। ব্যাকুলভাবে ডাকা চাই। ব্যাকুলতা থাকিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন "হে ভগবান্, আমাকে পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো, শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

দাও অচল অটল বিশ্বাস ভক্তি, রতি মতি রাঙ্গা চারণে।
(আমার) চঞ্চল চিত কর প্রশমিত করুণা বারি সিঞ্চনে॥
খুলে দাও আঁখি অন্ধ ঘুচে যাক মনের দ্বন্দ্ব
তোমায় হেরি হরি আছ বিশ্বভরি অনুপম প্রেম নয়নে।
দেখায়ে প্রেমের আলো, করে ধরে নিয়ে, চল,
চলি তব পথে না পড়ি ভ্রমেতে গহন সংসার কাননে॥
জাগাও আকুল পিয়াসা তোমায় দেখিবার হৃদয় লালসা,
ভাবে ভুলে যাই আপন হারাই নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে।
নাশ অভাব কুভাব বাসনা আর নূতন বাসনা দিওনা
দিয়ে দরশন হে প্রাণমন জুড়াও তাপিত জীবনে॥
এই নিবেদন তব কাছে আর যে কটা দিন বাকী আছে
যেন মন প্রান খুলে গৌর হরি বলে আনন্দ জীবনে॥

ধর্ম্ম—

মুক্তি লাভের পথে প্রথম আয়োজন প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মভাবের উন্মেষণ। ধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে প্রথমে "ধর্ম্ম কি ?" এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

ধর্ম্ম অর্থে "ধরতি লোকান্ ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মাভিরিতি।" অর্থাৎ যাহা লোক সমূহকে ধারণ করিয়া আছে বা যদ্দারা পুণ্যাত্মাগণ সংরক্ষিত হ'ন তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ ধৃ ধাতু (পোষণ করা) + ম

কর্ত্তরি। যিনি সকল জীবকে পোষণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক কে সকল জীবকে পোষণ করে। যদি বলা যায় অন্নই আমাদের সকলকে পোষণ করিতেছে; অতএব অন্নই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। তাহা হইতে পারে না। কারণ এক অন্নের দ্বারা সকল জীবের পুষ্টি সাধন হয় না। ধর্ম্ম কখন পৃথক্ হইতে পারে না। যেখানেই পৃথক্ ভাব, সেইখানেই অধর্ম্ম। অধর্ম্মের বিপরীতই ধর্ম্ম। অতএব জীব বিশেষের পক্ষে অন্নের পৃথকত্ব হেতু উহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আর একটী এমন মহৎ বস্তু আছে যাহা ব্রহ্মাদি কৃমি পর্য্যন্ত প্রাণিগণে, বৃক্ষলতাদি স্থাবর জঙ্গমে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের চেতন অচেতন ভূতমাত্রেই অবস্থান করিয়া সর্ব্বভূতেরই পোষণ করিতেছে। উহাই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ। তিনি সকল ঘটেই প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি জীবমাত্রের অভীষ্ট দেবতা। মণি মুক্তার মালার মধ্যে যেমন সূত্র থাকে, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ সূত্ররূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া জীবমাত্রেরই পোষণ করিতেছেন। তিনি সমস্ত জীবের একমাত্র ধর্ম্ম এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য দেবতা ও সত্য। সেই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ যবন দেহে যেরূপ বিরাজ করিতেছেন, হিন্দু দেহেও তদ্রূপ বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তিনি দেহও নহেন, মুসলমান, হিন্দু বা ইংরাজও নহেন; অথচ যখন যাহাতে থাকেন তখন তিনি তাহাই। তিনি সুনির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, বাক্যের অতীত, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানানন্দস্বরূপ বিগ্রহ। তিনি প্রেমময়, দয়াময়। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্যও নাই! তিনিই লীলাময়।

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্"।

বাসুদেব উপনিষৎ।

প্রাণশক্তির সাধনা

বা

অজপা।

"শিবাদি কৃমিপর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনম্।
নিশ্বাসঃ শ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

শিবাদি কৃমি পর্য্যন্ত প্রাণিগণের শ্বাসরূপে যে নিশ্বাস বহিতেছে, তাহাই মন্ত্র। স্থির প্রাণই মন্ত্র, যেহেতু এই স্থির প্রাণের দ্বারাই মনের পরিত্রাণ হয়। সেই স্থির প্রাণ অর্থাৎ আত্মাই গুরু।

"আত্মা বৈ গুরুরেকঃ" ইতি কুলার্ণব তন্ত্র। শ্রুতিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

"প্রাণো হবৈ মাতা প্রাণো হবৈ পিতা
প্রাণো হবৈ আচার্য্যঃ—

ইতি শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ স্থির প্রাণই মাতা স্থির প্রাণই পিতা, স্থির প্রাণই আচার্য্য। এখানে স্থির প্রাণ অর্থে আত্মা বুঝিতে হইবে।

প্রাণায়াম—

এখন দেখা যাউক কি উপায়ে মনকে চাঞ্চল্য রহিত করিয়া স্থির

করা যায়। প্রাণায়াম ব্যতীত মনকে কোন মতেই স্থির করা যায় না। শাস্ত্রে প্রাণায়াম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন এবং প্রাণায়ামই বা কাহাকে বলে, এক্ষণে তাহার বিচার করা যাউক।

প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্য গোচরঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্য সারোহি পাপরাশি তুলানলঃ॥
মহাপাতক কোটীনাং তৎকোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপংনানা দুষ্কর্ম্ম পাতকম্
নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ সোহভ্যাস যোগতঃ॥

অর্থাৎ প্রাণায়ামই মহাধর্ম্ম, তাহা বেদেরও অগোচর, সকল পুণ্যের সার এবং সর্ব্বপ্রকার পাপরাশি বিনাশক। ইহা দ্বারা কোটী মহাপাতক, কোটী কোটী দুস্কর্ম্ম, এবং পূর্ব্বজন্মাৰ্জ্জিত পাপ সকল এবং নানা দুষ্কর্ম্মজনিত পাতকের ধ্বংস হয়। যিনি এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন, তিনিই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য।

প্রাণায়ামদ্বারা শূন্যমার্গে বিচরণের ক্ষমতা হয় এবং সকল রোগের বিনাশ হয়। প্রাণায়ামই যে সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যোগপথে প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ পথ। যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রথমতঃ ব্যাধি-নিবারণ হইয়া শারীরিক উন্নতি হয়। ক্রমশঃ রোগ শোকাদির নাশ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে থাকে। তখন মন নির্ম্মল হইয়া দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইতে থাকে। মন যতই স্বচ্ছ হয় ততই তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা প্রতিফলিত হইতে থাকে। তখন মনের চাঞ্চল্য দূর হওয়ায় জীবের স্থিরত্ব পদলাভ হয় এবং অপার আনন্দসহকারে অমরত্ব লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মে লীন হয়।

যোগাভ্যাস বা প্রাণায়াম সাধু নারায়ণগণের মধ্যেও প্রচলিত আছে। গোরক্ষনাথ, নানক, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি মুক্ত পুরুষেরাও যে শ্বাস-ক্রিয়ার দ্বারা ভগবৎ সাধনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মুনি ঋষিরাও যে প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের দ্বারা জীবন্মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। এমন কি মুক্তপুরুষ শুকদেবও প্রাণায়ামের দ্বারা সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। অতএব সর্ব্ববাদিসম্মত যে মত তাহাই গ্রহণ করা উচিত।

জীবের স্বধর্ম্ম—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, বেদব্যাস প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথ ধরা জীবের স্বধর্ম্ম। স্ব অর্থে আত্ম বা আপনি। সুতরাং আত্মার ধর্ম্ম বা আপনার ধর্ম্ম জীবমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। সেই আত্মার ধর্ম্মে রত থাকার নাম স্বধর্ম্ম পালন করা। প্রাণই সেই আত্মা এবং তিনিই শ্বাসরূপে সর্ব্ব জীবে এবং বৃক্ষাদিতেও বিরাজ করিতেছেন।

"প্রাণোবায়ুরিতিখ্যাতঃ।"

গন্ধর্ব্বতন্ত্র।

এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্রে প্রাণকে কি বলিয়াছেন ;

প্রানোহি ভগবাণীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

অর্থাৎ প্রাণই ভগবান ঈশ্বর প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা, প্রাণই সমস্ত জীবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সমস্ত জগৎ প্রাণময়।

ঈশ্বর বলিয়াছেন ;

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচা মনো বাচা বিলীয়তে ॥

অর্থাৎ "অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি এবং মনের দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি ও বাক্যের দ্বারা মনের লয় হইয়া থাকে।" যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না, অর্থাৎ যাহা শূন্যেরও (শূন্যকেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন) অতীত তাহাই অব্যক্ত। অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন সেই প্রাণই আত্মা। "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ" ; অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র গুরু। সেই গুরুই আমার প্রাণ—আচার্য্যোহবৈ প্রাণঃ। এই সব প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে প্রাণায়ামাভ্যাসী সাধকেরা সামান্য বায়ুর সাধন করেন না; তাঁহারা প্রাণের সাধন করায় আত্মারই সাধন করিয়া থাকেন। ইহাই জীবমাত্রের স্বধর্ম্ম।

প্রাণকর্ম্ম বা সহজকর্ম্ম—

অতএব শাস্ত্রাদি প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে প্রাণায়ামই মহাধর্ম্ম এবং ভগবৎ সাধনের প্রধান উপায়। সুতরাং এই প্রাণায়ামই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য এবং ইহাকেই সহজ সাধন কর্ম্ম বলে। সহজ = সহ + জ, সহজাত অর্থাৎ জন্মের সহিত যাহাকে পাওয়া যায়। আমরা একমাত্র প্রাণকে জন্মের সহিত পাইয়াছি ; সুতরাং প্রাণকর্ম্মই আমাদের সহজ কর্ম্ম।

সহজে আসে সহজে যায়,
সহজ সন্ধান কেহ না পায়।
সহজ সন্ধান জানে যে,
তিন লোকের ঠাকুর সে ॥

যদি বলা যায় যে এই দেহও ত আমরা জন্মের সহিত পাইয়াছি, তবে এই দেহের ধর্ম্ম আমাদের স্বধর্ম্ম নহে কেন? তাহার কারণ এই যে প্রাণের অভাবে দেহের অস্তিত্ব থাকে না—দেহের নাশ হয়। সেইজন্য প্রাণকর্ম্ম আমাদের সহজ কর্ম্ম—যাহা আপনা আপনি হইতেছে, সেই প্রাণের বিস্তার করার নাম প্রাণায়াম। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

গীতা। ১৮।৪১

অর্থাৎ "জন্মের সহিত যে কর্ম্ম পাওয়া গিয়াছে তাহা দোষযুক্ত হইলেও কোন ক্রমেই ত্যাগ করিবে না। কারণ সকল কর্ম্মই আরম্ভের মুখে ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় কোন না কোন দোষ যুক্ত থাকে।"

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বাবলী 'বিবর্ত্ত বিলাশ' নামক পুস্তকে লেখা আছে—

"সহজ সাধন সহজ ভজন ইহা ছাড়া কিছু নাই।
"ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ ঐকাতা করিয়া মনে॥"

এককালে শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস গোস্বামী নিত্যানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব চূড়ামণি সহজরূপ প্রাণায়ামের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া ঐ সহজ কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অতএব ভ্রাতৃগণ আর নিদ্রা যাওয়া ভাল দেখায় না। ঐ দেখ সন্মুখে 'কাল' দণ্ড হস্তে উপস্থিত। কাল শব্দে সময়; সেই কালই

আমাদের প্রাণ। ভগবান্ বলিতেছেন, 'কালঃ কলয়তামহম্'; "আমিই কাল, আমি তাহার সংখ্যা। এই ঘটস্থ কালের সংখ্যা হইতেই আমরা সময় পাইয়াছি। নচেৎ মহাকাল অনন্ত তাহার সংখ্যা নাই। এই সংখ্যা হইতেই 'সাংখ্য' এবং ইহাই অজপা।

যাহা ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছে। জাগিয়া থাক, আর ঘুমাইও না। জাগিয়া থাকিলে আর চুরি হইবে না। জাগ্রত ঘরে প্রায় চুরি যায় না। লক্ষ্যচ্যুত হইলেই চুরি হইবে, অতএব সাবধান হও। যাহাতে সদা সর্ব্বদা প্রাণে লক্ষ্য থাকে তাহা কর। যে অবস্থায় সদা আপনা আপনি প্রাণে লক্ষ্য থাকে তাহাই সহজাবস্থা।

কবীর সহজ সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"কবীর সহজহি ধুনি লাগি রহে সেত এহত ঘট মাছি।
হৃদে হরি হরি হোৎ হ্যায় মুখ কি হাজত নাহি॥"

অর্থাৎ "সহজ"রূপ ধুনি এই শরীর মধ্যেই লাগিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতেই আপনা আপনি 'হরি হরি' হইতেছে, মুখে চীৎকার করিবার আবশ্যক নাই।" সহজ যে প্রাণ যাহা আপনি আপনি চলিতেছে তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই সব জানিতে পারিবে।

প্রকৃত সুখলাভ, পূর্ণানন্দ বা শান্তি লাভ করিতে হয় সর্ব্বদা প্রাণের উপর লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে মন প্রাণ উভয় শীতল হয় এবং প্রকৃত

যাবজ্জীবো জপেন্মন্ত্রমজপা সংখ্যকেবলম্।

(ঘেরণ্ড সংহিতা-৮৮)

জীব শরীর পরিগ্রহ করিয়া যাবৎ জীবিত থাকে তাবৎ যথাবিহিত পরিমিত সংখ্যায় অজপা মন্ত্র জপ করে।

সুখ বা শান্তি অনুভূত হয়। প্রাণের এই স্থিরাবস্থাই সাধুদিগের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য স্থান আর নাই। মহাত্মা কবীর ও এই কথা বলিয়াছেন,—

কবীর অজপা সুমীরণ হোৎ হ্যায়,
কাঁহা শান্ত কো হি ঠৌর।
কর জিহ্বা সুমীরণ করে
এহো সব মন কি দৌড় ॥

অর্থাৎ অজপা স্মরণই সাধুদিগের একমাত্র অবলম্বন, করের দ্বারা জপ বা জিহ্বার দ্বারা নাম জপ করা এ সকল মনের দৌড় মাত্র, ইহাতে কিছুই কাজ হয় না।

কবীর্ অজপা সুমীরণ হোৎ হ্যায়
শূন্য মণ্ডল অবস্থান্।
কর জিহ্বা তঁহা না চলে
মন পঙ্গুল তঁহা যান ॥

অর্থাৎ অজপা স্মরণের দ্বারা শূন্য মণ্ডলে অবস্থান হয়। কর ও জিহ্বা যেখানে যাইতে পারে না, মন খঞ্জ হইয়া হইয়া সেইখানে যায়।

কবীর মালা কাঠকী বহুৎ জপ করি ফের।
মালা ফের শ্বাসকী যাহে গাঁঠী নাহি সুমের ॥

অর্থাৎ কাঠের মালা ত অনেকে ফিরাইয়া থাকে, তাহাতে কিছুই হইবে না, শ্বাসের মালা ফিরাও, যাহাতে সুমেরুর গাঁঠ নাই।

মালার সংখ্যা যেখানে শেষ হয়, সেইখানে একটী বড় দানা থাকে ; সেই দানাটীকে সুমেরু কহে। বস্তুত অজপা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ, তাহতেে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অজপার অধিকারী—

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রাদি অন্য জাতি প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন করিতে পারেন না। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা শূদ্রাদির আলোচ্য নহে বলিয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এইরূপ অবস্থায় শূদ্রাদিরা কি করিবে? অজপা সাধন করিবার অধিকার সকলের আছে।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
গীতা ৯।৩২

অর্থাৎ "পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে, পাপযোনিই হউক, শূদ্রই হউক বৈশ্যই হউক, কিংবা স্ত্রীলোকই হউক, সেও পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।" কিন্তু ভগবানের এই বাক্যের সহিত শাস্ত্রীয় অন্য বচনের অনৈক্য হইতেছে। যথা—

"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাম্ ন শ্রুতি গোচরা।"

অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (পতিত ব্রাহ্মণ) ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নহেন। বহির্লক্ষ্যের অর্থে বস্তুতঃ এই বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলে উভয় বাক্যেরই একই অর্থ দেখা যায়।

কথিত আছে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানাত্তু ব্রাহ্মণঃ ॥

অর্থাৎ জন্মমাত্রেই শূদ্র, তাহার পর সংস্কার হইলে দ্বিজপদ বাচ্য, তৎপরে বেদ পাঠে বিপ্র, এবং ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে ব্রাহ্মণ বলা যায়। সুতরাং যিনি সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই কেবল ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইতে পারেন। নতুবা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না বস্তুতঃ সাধন ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

দেবর্ষি নারদ, ভক্ত বিদুর দাসী পুত্র হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; জাবাল ঋষি, মতঙ্গ ঋষি, কবজ ঋষি, নীচবংশীয় ছিলেন। বশিষ্ঠ অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যার দ্বারা আত্মোন্নতি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। গার্গী ও আত্রেয়ী স্ত্রীলোক হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শূরদাস নীচবংশে মুচির গৃহে জন্মিয়াও মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব স্ত্রী শূদ্রাদিরও প্রাণায়ামাদি যোগসাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকার আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি উপাধি যে গুণ ও কর্ম্মগত, বংশগত নহে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব

"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাঽত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা"

এই যে শাস্ত্রীয় বচন ইহা কি মিথ্যা? বাস্তবিক ইহাও মিথ্যা নহে। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে যখন জন্মগ্রহণ মাত্রেই সকলেই শূদ্র, তখন প্রণবদীক্ষা তো কাহারও হইতে পারে না। এই জন্য

সকলকেই সংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইতে হয়। তা'রপর বেদ পাঠ দ্বারা বিপ্র, এবং অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে হয়।

নারদ ব্যাসদেবকে কহিলেন—

"হে মহর্ষি, আমি পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কোন দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।"

অব্যক্ত অবস্থা—

সকল জীবই মালার ন্যায় একটী সূত্রে আবদ্ধ। এই সূত্রই যে আমাদের প্রাণ। সেই সূত্ররূপী ভগবান্ প্রত্যেক জীবে শ্বাসরূপে বিরাজ করিতেছেন। তজ্জন্য সেই সূত্ররূপী নারায়ণকে অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের নিজ নিজ দেহের মধ্যে অন্বেষণ করা আবশ্যক। ভগবান্ যে প্রতি ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মনুষ্যের এই শরীররূপ যন্ত্র মধ্যে প্রাণরূপে ব্রহ্মসূত্র রহিয়াছে। কিন্তু আমরা সেই সূত্র হারা হইয়া পড়িয়াছি। সেই জীবন স্বরূপ হরিতে লাগিয়া থাকুন, তাহা হইলে আপনি হরি হইয়া যাইবেন। অর্থাৎ ত্রিতাপের নাশ হওয়ায় অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। ঐ অব্যক্ত অবস্থা মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। সেই অব্যক্ত অবস্থা একমাত্র প্রাণের সাধন দ্বারাই পাওয়া যায়। যেহেতু অব্যক্ত হইতেই প্রাণের উৎপত্তি। সুতরাং আমরা এই প্রাণ ছাড়িয়া যাহা কিছু করিতে

নারদ উবাচ,

"অহম্ পুরাতীত ভবেহভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।"

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।২৩

 232372

যাইব, তাহাই অব্যক্ত হইতে দূর। মনুষ্য অব্যক্তের যত নিকটে থাকিবে ততই জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইবে এবং যতই দূরে যাইবে ততই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইবে।

মনঃস্থৈর্য্য

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহংমন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

গীতা ৬:৩৪

হে ভগবন্! মন বড় চঞ্চল ও অনায়ত্ত, ও অজেয়; সে শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। মনকে আয়ত্ত করা, তাহার নিরোধ সাধন করা অসাধ্য ব্যাপার। স্বচ্ছন্দ বিহারী বায়ুর গতি যেমন রোধ করা যায় না; মনের গতিও সেইরূপ রোধ করিতে পারি না।

• •

চঞ্চল মন—

•

নরনারায়ণ অর্জ্জুন বড় ক্ষোভেই শ্রীভগবান্‌কে উপরি উক্ত কথাটী বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মাই যখন চিত্তচাঞ্চল্য হেতু এতাদৃশ্য অভিভূত হইয়াছিলেন তখন আর 'অন্যে পরে কা কথা'। অর্জ্জুনের এবম্বিধ আশঙ্কার বিশদব্যাখ্যা স্বরূপ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রমুখ টীকাকারগণ মনের চঞ্চলতা কত প্রবলা, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন মন কেবল চঞ্চল নয়, পরন্তু 'প্রমাথি'। প্রমাথি অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয় বশীভূতকারী। অপিচ বলবৎ, তাহাকে কেহ দমন করিতে পারে না। অধিকন্তু দৃঢ় অর্থাৎ তন্তু-

নাগবৎ (নাগপাশের ন্যায়) অচ্ছেদ্য। বিবেক কি করিবে! ফলতঃ যে মন এইরূপ দৃঢ় এমন চঞ্চল, বিবেক তাহার উপর কোনরূপ কর্তৃত্বেই সমর্থ নহে। এইরূপ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—বহু দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পান্থ যেমন বিপন্ন হয়, সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মনও সেইরূপ আত্মাকে বিপন্ন করে। শ্রীধরস্বামী, শ্রীবলদেব, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি টীকাকারগণ 'মনস্থৈর্য্য' সাধন পক্ষে একেবারে হতাশ্বাস হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুদৃঢ় লৌহকে যেমন সূক্ষ্ম সূচীর দ্বারা বিদ্ধ করা যায় না, অথবা বায়ুকে যেমন মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে, চঞ্চলচিত্তকে সেইরূপ স্থির রাখা অসম্ভব।

মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা মনের বশীভূত হইয়া করে, কিন্তু সেই মনের ধর্ম্মই চঞ্চলতা। মন এক মুহূর্ত্ত ও স্থির থাকে না এবং একবিষয়ে সর্ব্বদা থাকিতে চাহে না। মনকে স্থির করিতে না পারিলে সাধনাদি কিছুই হইবে না। স্থিরমন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় এবং তদ্দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। চঞ্চল মনের দ্বারা উহা কখনই সম্ভব নহে। অতএব অগ্রে মনস্থির করা আবশ্যক-নচেৎ সব বৃথা।

মনে কর আমি কর্ণের দ্বারা একটী শব্দ শুনিতে বসিলাম—কিন্তু মনঃসংযোগ না হইলে কর্ণ কখনই শব্দ শুনে না। আমি গৃহেরমধ্যে পুস্তক, কিংবা কাগজ পড়িতেছি, সেই সময় ঘড়ি বাজিয়া গেল, আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে কর্ণ কখনও শব্দ শুনে না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না থাকিলে কর্ণও তাহা শুনিতে পায় না। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অতএব সর্ব্বতোভাবে মনকে স্থির করা আবশ্যক।

চিত্তবৃত্তিনিরোধ—

চিত্তবৃত্তিনিরোধ ভিন্ন জীবন্মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। "প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের জন্য গৃহীত জন্ম পুরুষের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, রাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের ধর্ম্মসমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে সুতরাং চিত্তবৃত্তিনিরোধ না হওয়ায়, মুক্তিলাভ ঘটে না।"

এবম্বিধ কারণে মুক্তি সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ান্বিত হইয়া অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবান্‌কে পূর্ব্বরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান্ তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুধাবন করা আবশ্যক। ভগবান্ বলিয়াছেন,

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

গীতা ৬।৩৫।৩৬

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তুমি মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ, অভ্যাস ও বিষয় বিতৃষ্ণা সহকারে তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ প্রাপ্তির আশা অতি অল্প। কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান্ হইলে যোগলাভে সক্ষম হন।

অর্জ্জুনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে, চঞ্চল মনকে বশীভূত করা

বড়ই কঠিন,—ভগবান্ ইহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন অভ্যাস সহকারে আত্ম সংযম করিতে হইবে। 'সমাধিদ্বারা ও বিষয়বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে।' মন বশীভূত করার নামই চিত্তনিরোধ। চিত্তনিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মানুষের সকল মঙ্গলের মূল—চিত্তনিরোধ।

চিত্তসংযম—

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন,—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলম স্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

গীতা ৬।২৬

"স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং অস্থির এই মন যখনই অভ্যাস বশতঃ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে তখনই সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করিতে হইবে।" ইহার মত ঔষধ আর নাই, কিন্তু অটল ধৈর্য্য চাই এবং ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ চাই। মনকে জয় করা কঠিন বলিয়াই তো মনের উপর আধিপত্য আর কোথাও স্বীকার করা হয় নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তজ্জন্যই বলিয়াছেন—"জিতং জগৎ কেন—মনো হি যেন।" "কে সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছে? যে মনকে জয় করিয়াছে।"

মন কিন্তু স্বভাবতঃই চঞ্চল ও দৃঢ়, তাহাকে জয় করা সহজ ব্যাপার নহে। প্রথম প্রথম তো বসিবামাত্র মনে রাজ্যের চিন্তা আসিয়া জুটিবে, এবং যে সমস্ত বৃথা চিন্তা অন্য সময়ে হয়তো তত বিক্ষিপ্ত করে না সেই গুলিই চিত্ত স্থির করিবার জন্য বসিলে

তরঙ্গাকারে আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন বাস্তবিকই চিত্ত স্থির করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এমন কি নৈরাশ্য ও বিরক্তি পর্য্যন্ত আসে। কারণ স্থির হওয়ার যে আনন্দ তাহা তখন উপলব্ধি হয় না ; উপরন্তু চাঞ্চল্যের প্রভাবে প্রাণ বিরক্তিতে ভরিয়া যায় এবং এই প্রকার যুদ্ধকে একটী নীরস সাধনা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রথম শিক্ষার্থীরা সাবধান হইবেন যেন তাঁহারা ইহাতে নিরাশ না হ'ন।

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মের প্রারম্ভেই কিছু না কিছু দোষ থাকে। সুতরাং ভয় পাইলে চলিবে না।

এমন সময়ে কি কর্ত্তব্য ? শুভকামী মাত্রেই সাধনাভ্যাসের পূর্ব্বে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া লইবেন—যাহা বাজে চিন্তা বা মিথ্যা সংকল্প তাহা কিছুতেই আসিতে দিব না। অবশ্য খুব চেষ্টা, খুব দৃঢ়তা থাকিলেও দেখিবে কতবার তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তুমি যাহা ভাবিবে না মনে করিয়াছিলে, অজ্ঞাতসারে সেই চিন্তাতেই তুমি নিবিষ্ট আছ দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে। ইহার একমাত্র ঔষধ যেমনি চেতনা হইবে তেমনি সজোরে বলিবে "দূর হ' দূর হ'।" এই প্রকারে অভ্যাস দ্বারা মনঃস্থির প্রথমতঃ চেষ্টা করিতে হইবে, অন্ততঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে মনকে স্থির রাখিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

চিত্তনিরোধের উপায়—

চিত্তনিরোধ ব্যতীত কখনই মানুষ 'গুরুকৃপা' কিংবা ভগবৎ দর্শনলাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু চিত্তনিরোধ স্বরূপতঃ কি প্রকার তাহা একটু বুঝা প্রয়োজন। লোভজনক পদার্থ দর্শন না করিলে বা প্রীতি-

জনক স্বর শ্রবণ না করিলেই যে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইল এমন নহে। মন যদি তৎসমস্ত উপভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে বলপ্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রিয় নিরোধ না করিলে কোনই শুভফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ক্রমনিরোধরূপ উপায় দ্বারা চিত্ত জয় করাই যুক্তিযুক্ত। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "অনিন্দিতা যুক্তি ব্যতীত কেবল বার বার উপবেশন করিলেই চিত্ত জয় করা যায় না।" অঙ্কুশদ্বারা যেমন দুষ্ট মাতঙ্গকে বশীভূত করা অসম্ভব তদ্রূপ (১) অধ্যাত্মবিদ্যা, (২) সাধু সঙ্গ (৩) বাসনাত্যাগ, (৪) প্রাণাস্পন্দ নিরোধ এই উপায় চতুষ্টয় ব্যতীত চিত্ত জয় করা অসম্ভব।

অধ্যাত্ম বিদ্যা—

যুক্তি দ্বারা এই সকল উপায় সাধিত না করিয়া যিনি চিত্তজয়ের প্রয়াস পা'ন, তিনি দীপঃঅপসারিত করিয়া অঞ্জনদ্বারা অন্ধকার অপনয়নের চেষ্টা করেন। অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভাবে পদার্থ মায়া বিজৃম্ভিত ও মিথ্যারূপে উপলব্ধি হয় এবং সর্ব্বত্র সেই 'পরমাত্ম সত্য পরমানন্দ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বিরাজিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। সুতরাং মিথ্যা দৃশ্য পদার্থ বিষয়ে প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি হয় এবং পরমার্থ সত্য ও পরমানন্দ স্বপ্রকাশ পদার্থের সহিত সম্মিলনই একমাত্র প্রয়োজনরূপে উপলব্ধি হয়। তখন চিত্ত ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় স্বতঃই অলীক বিষয় বাসনার অনুসরণ করিতে বিরত হইয়া থাকে।

প্রাণাস্পন্দ নিরোধ—

গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ" (৪।২৯) কেহ প্রাণ ও অপানের গতি আর্থাৎ শ্বাসের স্পন্দন নিরোধ পূর্ব্বক প্রাণায়াম পরায়ন হয়।

উপরোক্ত বাক্যের টীকায় গীতার্থ সন্দীপণী বলিয়াছেন, "কোন কোন সাধক অজপা মন্ত্রের অনুলোম বিলোমে হংসঃ ও সোঽহমিতির দ্বার তত্ত্বমসীতি বাক্যে জীবব্রহ্মের একানুভব করিয়া থাকেন।

সাধুসঙ্গ—

সাধু-সঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥

চৈঃ চঃ মধ্য। ২২।৪৩

"তুলায়মলবেনাপি নস্বর্গং না পুনর্ভবন্।
ভগবৎ সঙ্গি সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাংকি মুতাশিষঃ॥"

ভাগবত।১।১৮।২৩

অর্থাৎ ভগবৎ সঙ্গি সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছু মাত্র তুলনা হইতে পারে না।

যিনি, বুঝাইলেও সমস্ত তত্ত্ব সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারেন না অথবা তৎকালে প্রণিধান করিলেও বিস্মৃত হ'ন, তাঁহার পক্ষে "সাধু সঙ্গ" নিতান্ত আবশ্যক। কারণ কৃপা-পরায়ণ সাধুগণ পুনঃপুনঃ নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াও তৎসমস্ত স্মরণ করাইয়া মুমুক্ষুকে প্রকৃষ্ট মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দে'ন না।

সাধু সঙ্গ—ইহাই সংসার মুক্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু প্রকৃত সাধু কে? সাধু যিনি তিনি সদা প্রসন্নচিত্ত বা সমচিত্ত, নিস্পৃহ—কোন কিছুতে তাঁর ইচ্ছা নাই। সাধুর পুত্র ধনজন যদিও বিদ্যমান থাকে তাহাতেও তাঁহার কোন আসক্তি নাই, ইনি মনকে বশ করিয়া সর্ব্বদা প্রশান্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে দমন করিয়াছেন বলিয়া দান্ত, ইনি শ্রীভগবানের

ভক্ত; ইনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়াছেন। সাধু সর্ব্বদা "আমি কে এবং জগৎ কি" এই বিচার তৎপর এবং দৈব যোগে যাহা কিছু মিলে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। অধুনা জিজ্ঞাস্য হইতেছে—এইরূপ সাধুসঙ্গ কলির জীবের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যাঁহারা এরূপ গুরু পান নাই, এইরূপ সাধু পুরুষের সঙ্গ যাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের উপায় কি? শাস্ত্র তাঁহাদের জন্য সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ইহা করেন তাঁহারাই জানেন সৎশাস্ত্র, জ্ঞান ও ভক্তি পথের কত সহায়ক। সৎশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমৎ ভাগবত, গীতা, দেবী ভাগবত, চণ্ডী, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি। ফলে যতদিন না একনিষ্ঠা জন্মিতেছে, ততদিন শ্রীভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা হয় নাই। একনিষ্ঠাতে একমাত্র ঈশ্বরই থাকিবেন। অন্য সমস্তই উপেক্ষার বস্তু। মনুষ্য বাহিরে যাহা কিছু প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে ছুটিয়া যায়, মন্ত্র, ইষ্ট ও গুরু স্মরিয়া স্মরিয়া মন হইতে তাহা বাহির করিয়া দিতে হইবে। 232372

কোন কোন বীর সাধককে বলিতে শুনা যায়—আমার কর্ম্ম যদি আমাকে কোথাও টানিয়া লইয়া যায় তাহার উপর আমার হাত কি? অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করাই "সাধনা" বা "সাধুসঙ্গ"। অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারই "প্রকৃতি"। প্রকৃতি যেমন, মানুষের সঙ্গে আছেন, পুরুষও সেইরূপ সঙ্গে আছেন। পুরুষের স্থানীয় হইতেছেন ইষ্ট, মন্ত্র ও গুরু। ইহাঁদের সাহায্য লইয়া কর্ম্ম সংস্কার জয় করিতে হইবে। যে বীর সাধকেরা এইরূপ করেন তাঁহারাই প্রকৃত "সাধুসঙ্গ" করেন ও মুক্ত পুরুষ। যাঁহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন না তাঁহারা ভোগ লাম্পট্যে সংসারই করেন—ইহাঁদের ভাগ্যে "সাধুসঙ্গ" লাভ এখনও হয় নাই।

বাসনা নিরোধ—

যে ব্যক্তি স্বকীয় বিদ্যাদির অভিমানে সাধুসঙ্গের অনুবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ বাসনা নিরোধ করাই বিহিত ব্যবস্থা। বাসনা অতি প্রবলা। সুতরাং তাহার নিরোধ সাধন যাঁহার সাধ্যাতীত তাঁহার পক্ষে প্রাণাস্পন্দ নিরোধ করাই বিধেয়।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য—

প্রানাস্পন্দ বাসনাই চিত্তকে বিষয়ানুসারে প্রবৃত্ত করে। অতএব এতদুভয়ের নিরোধ হইলেই চিত্তে শান্তি জন্মিয়া থাকে। অভ্যাস দ্বারাই প্রাণাস্পন্দ নিরোধ সাধ্য এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই বাসনা নিরোধ সাধ্য। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্যচিত্ত প্রশমিত করিবার বিহিত এবং অপরিহার্য্য ব্যবস্থা যেমন সেতুবন্ধন দ্বারা প্রবল বেগশালী নদী প্রবাহ নিরোধ করিয়া ক্ষুদ্র প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক ক্ষেত্রাভিমুখে বক্রভাবে নদীস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রবাহান্তরের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তনদীর বিষয় প্রবাহ নিরোধ করিয়া সমাধির অভ্যাস সহকারে তাহাকে প্রশান্ত বাহিতা করিতে হয়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ "অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের" কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্তস্থৈর্য্যের পথে অভ্যাস ও বৈরাগ্যই মানুষের প্রধান অবলম্বন, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে মনঃস্থির সম্বন্ধে অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটী কথা বলিয়াছেন। এত বড় ভরসার কথা আর কি থাকিতে পারে? ধন্য প্রভুর দয়া।

অভ্যাসের দ্বারা কি না হয়? যাহা দুঃসাধ্য তাহা সুসাধ্য

হয়। যাহা অতিশয় কঠোর অভ্যাসের দ্বারাই তাহাই পরে সহজ বলিয়া মনে হয়। আমরা যে চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না, ইহাও এই অভ্যাসের ফল। কত সংস্কার, কত অভ্যাস বোঝার মত মনের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। সে বোঝা নামাইতে না পারিলে আমাদের আর অন্য গতি নাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যদি তাঁহাকে ভার দিতে পার, তবেই তোমার অভ্যাস আসিবে। অভ্যাস অর্থে অবিচলিত চিত্তে, প্রত্যহ গুরুর উপদেশ পালন করা। একটা কার্য্য পুনঃ পুনঃ করাই অভ্যাস। যদিও মনকে স্থির করা সহজ নহে, তথাপি কোন প্রকারে স্থির করা চাই। মনকে স্থির করিবার অভ্যাস না করিলে আমরা আর কোনও অবলম্বন পাইব না। চঞ্চল জলের মধ্যে আমাদের যেমন বিকৃতরূপ দেখা যায়, তদ্রূপ চঞ্চল চিত্তে আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না। স্থির জলে যেমন প্রতিবিম্বকে অবিকৃত দেখায় তদ্রূপ স্থির মনের মধ্যেই আত্মার অবিকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। সেই জন্য স্থির মনকে যোগশাস্ত্রে 'আত্মা' বলা হইয়াছে। যিনি এই স্থিরপদ লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দেখিয়া আপনার জন্ম ও জীবন সার্থক করিয়াছেন। একদিনের জন্যও যিনি এই রসাস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্য সুখকে সুখ বলিয়া মনে

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।"

গীতা ৬।২০

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরোধ হয়, উপশম প্রাপ্ত হয়, এবং সে অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করে, তাহাই যোগশব্দবাচ্য।

হয় না—অন্য লাভকে লাভ বলিয়া মনে হয় না। যে অবস্থায় থাকিলে মহাদুঃখও অভিভূত করে না, তাহাই যোগ শব্দ বাচ্য কিংবা মনঃস্থিরের অবস্থা। এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা কিংবা মনঃস্থিরের দ্বারা একটা অনির্ব্বচণীয়, অতীন্দ্রিয় পুর্ণানন্দ লাভ হয়; এই অবস্থায় সংসারের অন্য কোন সুখকে সুখ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যতদিন এই অবস্থা লাভ না হয়, ততদিন কি করিতে হইবে? অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন।

প্রাণবায়ু ও যোগসাধন—

এক্ষণে কি অভ্যাস করিলে মঙ্গল হইবে, কি অভ্যাস করিলে পূর্ণানন্দ ও পূর্ণাশান্তি লাভ হইবে, কিংবা মুক্তি হইবে—অহেতুকী প্রেমভক্তি লাভ হইবে—তাহাই বিবেচ্য।

ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন "যোগঃকর্ম্ম সুকৌশলম্।" "সুকৌশল কর্ম্মই যোগ।" এই বেশ পাকা কথা। এখন সুকৌশল অর্থ কি তাহাই দেখা যাউক। কুশলতা সহকারে যাহা কর্ম্ম করা যায়, তাহাই সুকৌশল কর্ম্ম এবং ইহাতেই কর্ম্ম সিদ্ধি হয়। কোন বিষয় সফলতা লাভ করিতে হইলে তাহার প্রতি সমস্ত চেষ্টাকে একাগ্র করিয়া দিতে হয়, নচেৎ কোন কাজেই সফলতা লাভ করা যায় না। পরমাত্মার সহিত যদি আমার মনের যোগ স্থাপন করিতে হয়, তবে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ঈশ্বরমুখী করিয়া দিতে হইবে। মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিবার অনেক উপায় গীতাতে কথিত হইয়াছে। আবার ভগবৎ সাধন করিতে গেলে, বাক্য বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা করা গৌণ সাধন, কেন না প্রাণ হইতে ঐ সকল গৌণ। প্রাণের

অস্তিত্বতেই বাক্য, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের উৎপত্তি। প্রাণের উৎপত্তি অব্যক্ত হইতে। সুতরাং বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, শরীর—ইহারা সকলেই অব্যক্ত হইতে প্রাণ অপেক্ষা দূরে অবস্থিত। বিশেষতঃ প্রাণকে স্থির করিতে না পারিলে মনঃস্থির হয় না।

আপনি বলিতে পারেন কেন? কোন একটা বিষয়ে বা ভগবৎমূর্ত্তিতে মন নিবেশ করিবার অভ্যাস করিব। ক্রমশঃ এই অভ্যাসের দ্বারা আমার মনঃস্থির হইবে।" ইহা বলা যতটা সহজ, কার্য্য ক্ষেত্রে যে তদপেক্ষা অনেক কঠিন, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। অপরের জ্ঞাতব্য নহে। জীবমাত্রেই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের প্রত্যেকটাই দুর্জ্জয়। পরন্তু যখন ইহারা মিলিয়া আক্রমণ করে, তখন আর কে রক্ষা করিবে?

মনে করুণ, আপনি একটী তরকারী রন্ধন করিবেন। একটী পাত্রে করিয়া তরকারী, জল, লবণ, মসলা ইত্যাদি মিশাইলে অগ্নি ব্যতীত রন্ধন করা যায় না। উহা সিদ্ধ ও হইবে না। তদ্রূপ তেজোরূপ প্রাণকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়গণকে সিদ্ধ (জয়) করা যায় না। প্রাণের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। তরকারীর ন্যায় কাঁচাই থাকিবে। অসিদ্ধ তরকারী যেমন মনুষ্যের আহারে না আসিয়া পশুদিগের আহারে আইসে, তদ্রূপ অসিদ্ধ (অজিত) ইন্দ্রিয়গণও আত্মার উপকারে না আসিয়া পশুরূপী রিপুগণের উপকারে আইসে। অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি নিজের নিজের বুদ্ধির দোষে রিপুকুলের প্রধান্য বিস্তার করাইয়া আত্মার অধোগতি করায় মাত্র আত্মার উন্নতিই আত্মার উপকার, অধোগতিই আত্মার অপকার। সেই আত্মা প্রাণরূপে সমস্ত জীবেই রহিয়াছেন।

শ্বাসই প্রাণ। পাতঞ্জল দর্শনে আছে "প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ

লক্ষ্য দ্বারাও চিত্ত সংযম লাভ হইয়া থাকে।" এই উপায়টী এক সময়ে আমাদের দেশে সকলেই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রংপরং মতং ॥"

শিব সংহিতা ১।১৭।

মহাভারতে, ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে, এমন কি উপনিষদাদির মধ্যেও এই প্রাণায়ামের যথেষ্ট উপদেশ বর্ণিত আছে। তন্ত্রের ত কথাই নাই।

প্রাণায়াম কি? মোটের উপর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরুদ্ধ করার কৌশলের নাম প্রাণায়াম। শ্বাসপ্রশ্বাস কোন উপায়ে হঠাৎ যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের চাঞ্চল্যও তিরোহিত হয়। তাই তাঁহারা ধরিলেন, শ্বাসপ্রশ্বাসটা চলে বলিয়াই মনও চঞ্চল। যদি আমরা কোন কৌশলে এই শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রোধ করিয়া জীবিত থাকিতে পারি, তবে বাঁচিয়া থাকিয়াও মনকে স্থির করা যাইতে পারে।

"চলে বাতে চল চ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।"

প্রাণবয়ুকে চঞ্চল বলিয়া চিত্তও চঞ্চল, প্রাণবায়ুকে নিশ্চল করিলে চিত্তও নিশ্চল হয়। মুণী ঋষিরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রাণী স্বাভাবতঃ যতটা চঞ্চল, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের চাঞ্চল্যও সেই পরিমাণে কম। তদ্ব্যতীত তাঁহারা দেখিলেন, এই শ্বাসপ্রশ্বাস আমরা জীবনের সহিত

পাইয়াছি ; এবং আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা এই শ্বাসপ্রশ্বাস গতিরুদ্ধ হইলেই ঘটিবে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত আমাদের চিরসঙ্গী আর কেহই নাই। বিদ্যা বল, জ্ঞান বল, মেধা বল, বা অর্থ সামর্থ্য বল, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি নাই এবং যখন মৃত্যু আসিয়া অক্রমণ করিবে, তখনও এই সকল, কোনও কাজে লাগিবে না. কিন্তু এই নিশ্বাস জীবনের প্রথমক্ষণ হইতে হইতে আমরণ কাল সকল অবস্থাতেই আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে ও থাকিবে ; শরীর, রূপ, যৌবন সকলেরই মালিন্য ঘটে, ধ্বংসও ঘটে ; কিন্তু ইহার কোন পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস নাই, সেই একই রকম চিরকাল বহিয়া চলিয়াছে জগতের সমস্ত নশ্বরতার মধ্যে ইহার একটা আশ্চর্য্য অবিনশ্বর ভাব দেখিয়া, ইহাকেই তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট পৌছিবার একটী বিশিষ্ট পথ মনে করিয়াছিলেন। শ্বাস যেখানে লয় হইয়া যায় সেই স্থানকেই তাঁহারা নির্ম্মল ব্রহ্ম স্থান, কেহ বা আবার বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

নিষ্কলং তং বিজানীয়াৎ শ্বাসো যত্র লয়ং গতঃ।
তন্মনো বিলয়ংযাতি, তদবিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

বাস্তবিকই এই শ্বাস প্রশ্বাসই আমাদের চিরাবলম্বন এবং নিত্য আশ্রয় স্বরূপ। শ্বাসের সঙ্গেই আমাদের সব ফুরাইয়া যায়। শ্বাসই আমাদের একমাত্র সম্বল। যোগীশ্বররা বলিয়াছেন, শ্বাসের বহির্গমনের জন্য আমাদের চিত্ত চঞ্চল, ও বিক্ষিপ্ত হয়, এবং এই বিক্ষিপ্তচিত্তে বিচিত্র সংসারের বাসনা সমূহ জাগিয়া উঠে। বিক্ষিপ্ত চিত্তই সমস্ত সংসারের আশ্রয়, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন, যদি এই শ্বাসের বাহিরে যাওয়া

আসা বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে মুক্তি আমাদের আয়ত্ত হয়। যিনি যতই চেষ্টা করুন, প্রাণবায়ুর গতায়াত রুদ্ধ করিতে না পারিলে, বাসনা ও বিক্ষেপের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন।

মনু বলিয়াছেন,

দহ্যন্তে ধ্যায়মানাং ধাতুনাং হি যথামনাঃ।
অথেন্দ্রিয়ানাং দহ্যন্তে দোষঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হইলে ধাতুর মল সকল যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা অর্থাৎ অজপার দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়।

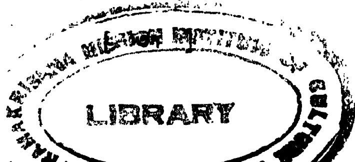
এই অজপা সম্বন্ধে সিদ্ধভক্ত কবীর বলিয়াছেন,

"শ্বাস প্রশ্বাস সুমীরণ করো আওর উপায় কুছ নাহি।"

মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। প্রাণের চঞ্চলতা না গেলে মন কিছুতেই স্থায়িরূপে এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। ইহা মনের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। অতএব অজপারূপ যোগাভ্যাস ব্যতীত আর কিছু উপায় নাই।

সহজ সাধন—

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অজপাকে "সহজিয়া" বলিয়া থাকে এবং একটী সম্প্রদায় আছে, তাঁহারা এই অজপারই সাহায্যে সাধনা করেন। জন্মের সহিত ইহা পাওয়া যায়, এইজন্য ইহার সাধনকে সহজ সাধন বলা হয়। এই সহজ সাধনের কথা চণ্ডীদাসও উল্লেখ করিয়াছেন। এই অজপা সাধন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।



এই অজপার আর একটী নাম 'প্রাণকর্ম্ম'। যে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বভাবতঃ উঠিতেছে ও নামিতেছে তাহাকেই প্রাণকর্ম্ম বা অজপা বলে।

অজপা ও হঠ প্রাণায়াম—

জোর পূর্ব্বক নিশ্বাস রোধ করায় যে প্রাণায়াম হয়, তাহা হঠ যোগ। অজপা ও হঠযোগের প্রাণায়ামে অনেক প্রভেদ। গৃহস্থ অজপা সাধন করিবে। হঠযোগ নহে। হঠযোগ সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রশস্ত। গৃহীর পক্ষে হঠযোগ নিষিদ্ধ। অতএব হে সাধক, তুমি অজপাকে হঠযোগ মনে করিয়া বিপথগামী হইও না। গুরুর শরণাগত হইয়া অজপা বুঝিয়া লও। হঠযোগ প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেইগুলি বড়ই কঠিন এবং উপযুক্ত গুরুর সাহায্য সাপেক্ষ। এমন কি ঐ সকল অভ্যাস করিতে গিয়া অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই সকল সাধনে যে সকল নিয়ম ও উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা এখনকার দিনে নানা কারণে এক প্রকার অসাধ্য। এই সকল যোগাভ্যাসের জন্য বড়ই কঠিন সংযম প্রয়োজন। আহার বিহার সম্বন্ধেও অনেক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। এ বিষয় আমার বক্তব্য নহে।

শ্বাসপ্রশ্বাসকে স্থির করিবার যেটা অত্যন্ত সহজ এবং আশঙ্কা বিহীন উপায়, এবং যাহাতে সকলপ্রকার ব্যাধি দূরীভূত হইবে এবং যাহাতে আত্মদর্শন ও প্রেমানন্দলাভ হইবে তাহাই অজপারূপ প্রাণায়াম।

সাধারণতঃ নিঃশ্বাসই চিত্তবিক্ষেপের বহির্লক্ষণ। চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত, তাহা শ্বাসের গতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তাই অধিকাংশ যোগী বহিঃপ্রাণায়ামের সাহায্যে চিত্ত বিক্ষেপ দূর করিতে চেষ্টা করেন।

পূরক, রেচক ও কুম্ভক দ্বারা শ্বাসের গতি সংযত করেন। চিত্তকে স্থির করিবার জন্য এই সকল অতি স্থূল উপায়। উহার দ্বারা চিত্তস্থির হইতে পারে কিন্তু আত্মলাভ হয় না। কারণ বহুদিন ঐরূপ অভ্যাসের ফলে চিত্তের প্রশান্ত ভাবই যোগীর লক্ষ্য হইয়া পড়ে। যদিও প্রশান্তচিত্ত আত্মলাভের লক্ষণ, তথাপি মনে রাখিও চিত্ত প্রশান্ত হইলেই আত্মলাভ হয় না। যে আত্মাকে চায়—বরণ করে, সেই তাহাকে পায়। তাই শ্রুতি বলেন,—

"যমেবৈষো বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং।"

(মুণ্ডকে)

যে যাহা চায় সে তাহাই পায়।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

তুমি চিত্তস্থৈর্য্য চাও, তাহাই পাইবে। মা যে আমার কল্পতরু। মাকে পাইলে চিত্ত যে স্বতঃই প্রশান্ত হয়, ইহা না বুঝিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিলে কদাপি অজ্ঞানতা দূর হয় না; অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না। বরং যাহারা বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত নহে এইরূপ গৃহস্থ লোকের পক্ষে ঐরূপ হঠ প্রাণায়াম অনেক স্থলে দুরারোগ্য রোগের হেতুস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাই বলি সাধক, সাবধান! হঠযোগ কখন গৃহী হইয়া অভ্যাস করিও না। গুরুমুখে অজপা বুঝিয়া লও—শ্বাসরোধ নহে—স্বভাবের উপর যে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়িতেছে তাহাকেই লক্ষ্য করার নাম অজপা, ইহা ভুলিও না। নিবিষ্টচিত্তে একান্তমনে এই যে অবিরত শ্বাস প্রশ্বাস পড়িতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত

কোন মন্ত্র (গুরু প্রদত্ত) মনে মনে জপ করাই অজপার সাধনা। মন্ত্রে দেবতার মুর্ত্তি ও ধ্যান থাকিবে। প্রথমতঃ অজপা মন্ত্র ও মূর্ত্তি ধ্যান করতঃ কেবলমাত্র লক্ষ্য করিবে তদ্‌পরে অর্থাৎ ২।৩ মাসের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস যে উঠিতেছে ও পড়িতেছে, এইটাতে মন রাখিতে পারিলে মন অতি অনায়াসে স্থির হয়। ইহার অভ্যাস দাঁড়াইয়া, চলিয়া, শুইয়া, বসিয়া সকল অবস্থাতেই সম্ভব হয়। অথচ শ্বাসপ্রশ্বাস জোরে জোরে টানা ফেলা করিবার আদৌ আবশ্যক হয় না।

চিত্ত স্থৈর্য্যের অন্য উপায়—

মনঃস্থিরের জন্য আরও নানারূপ উপায় আছে। যথা কোন একটী বস্তুতে বা মূর্ত্তিতে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবার অভ্যাস করা। চক্ষের পলক যতক্ষণ না পড়ে বা চক্ষে যতক্ষণ জল না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটী চিহ্নের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। চিহ্নটী কিছুদিন অন্তর ছোট করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয় এবং ক্রমশঃ চিহ্নটী সরাইয়া দিতে হয়।

"দৃষ্টি স্থিরো যত্র বিনাবলোকনম্।"

অবলোকন না করিয়াও দৃষ্টি স্থির—এইরূপ হইলে আর চিত্তবিক্ষেপ থাকে না। এইরূপ প্রত্যহ ১৫ মিনিটকাল দুইবার অভ্যাস করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়। লেখা বাহুল্য, যিনি যত অধিক সময় দিতে পারিবেন, তাঁহার চিত্ত স্থির করা তত সহজ হইবে।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে চিত্ত স্থিরের একটী উপায়—

"মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদম্।"

সুখী, দুঃখী, পুণ্যাত্মা ও পাপীর বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। কেন না অন্য লোকের সুখ দেখিলে আমরা কখন কখন ঈর্ষান্বিত হই, আমাদের কেহ শত্রুতাচরণ করিলে তাহার দুঃখ দুর্গতি দেখিতে ইচ্ছা হয় এবং পাপকারীর প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়। সংসারে থাকিলে এই সব ব্যাপার ঘটেই এবং তাহাতে চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হয়। সুতরাং সুখী দেখিয়া যদি সুখ লাভ করি, দুঃখীকে দেখিয়া যদি করুণার উদ্রেক হয়, পুণ্যাত্মাকে দেখিলে যদি আনন্দলাভ হয় এবং পাপীর পাপক্রিয়ার প্রতি যদি উপেক্ষা জন্মে তবে চিত্তবিক্ষেপের অনেকগুলি কারণের অভাব হইয়া চিত্ত একাগ্র হইয়া স্থৈর্য্যলাভ করে।

ঈশ্বরানুগত্য বা ভক্তানুগত্য—অথবা ঈশ্বরের প্রণিধান হইতেও একাগ্রতা লাভ হয়। এখানে ঈশ্বর অর্থে ভগবান্ অর্থাৎ ভগবৎভক্ত হইতে পারে। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মেরই সমান—ইহা শ্রুতির কথা। বাস্তবিক ভগবদ্ভক্তের এতাদৃশ প্রভাব যে তাহাদের স্মরণ করিতে করিতেও চিত্ত আনন্দে ভরিয় যায়। অর্থাৎ গুরুর মূর্ত্তি স্মরণ মাত্র প্রাণে আনন্দ আসে এবং সংসার বন্ধন খসিয়া পড়ে। সত্য কথা ভক্তের কৃপা না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, সেই জন্য ভক্তের শরণাগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

"মহৎ কৃপা বিনে কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

চৈঃ চঃ ২২।৪০

শ্বাসচৈতন্য

জন্ম ও মৃত্যু—

যদি আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য করি, তবে বুঝিতে পারি প্রতি মুহূর্তে আমরা মরিতেছি এবং প্রতি মুহূর্তে আমরা নূতন হইয়া জন্মিতেছি। আমাদের প্রাণশক্তির প্রতি শ্বাসগ্রহণে সংঘৃষ্ট ও উদ্দীপিত, নূতন বর্ণরঞ্জনায় অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগের দেহকে তদনুযায়ী ভাবে গঠিত করিতেছে; এবং পুরাতন ভাবটুকু প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসীভূত হইয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের পরমাণুগুলি বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপে মৃত্যু ও জন্ম আমাদিগের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের উপর অনবরত আধিপত্য করিতেছে। যখন আমরা সাত্ত্বিকগুণের দ্বারা পরিচালিত হই, তখন এই সৃজন বা পোষণ অধিক মাত্রায় হইতে থাকে; এবং সেই পোষণ শক্তি প্রভাবে আমরা ঊর্দ্ধ্ব গতি লাভ করিতে থাকি। রজঃ ও তমঃ শক্তি দ্বারা চালিত হইলে, আমাদের মৃত্যুরূপ ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং ঐ ধ্বংসশক্তির প্রভাবে আমাদের নিম্নগতি হয়।

খণ্ডমৃত্যু—মৃত্যুঞ্জয়—

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতেছি—প্রতি মুহূর্ত্তে আবার জাত হইতেছি; ইহাকে খণ্ড মৃত্যু বলে। এই খণ্ড মৃত্যুতে ও আমাদের জীবনের শেষ মৃত্যুতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। খণ্ড

প্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে যেমন শুধু মাত্রার ইতর বিশেষ। এই খণ্ডমৃত্যু যখন জীব বোধ করিতে সমর্থ হয়, তখন জীব মৃত্যুঞ্জয় তত্ত্বের তটস্থ লক্ষণে ভূষিত হয়; যখন মৃত্যু বোধ করিতে সমর্থ হয়, তখন মৃত্যুঞ্জয় হয়।

অব্যক্তের সন্ধান—

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতি শ্বাসে আমরা মরিতেছি, প্রতি শ্বাসে আমরা জীবন লাভ করিতেছি; সুতরাং বিশদভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, আমরা শ্বাসে শ্বাসে অব্যক্তে প্রবেশ করিতেছি। আবার অব্যক্ত হইতে নবশক্তি লইয়া প্রকাশিত হইতেছি। তাহা হইলে যদি শ্বাসের অনুধাবন করিতে পারি, ধীরে ধীরে শ্বাসের সহিত কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে যদি দেখিয়া যাইতে পারি, তবে অব্যক্তের সন্ধান পাইতে পারি। শ্বাসের অনুধাবন কর, শ্বাস কি ভাবে কোথায় আমার দেহাভ্যন্তরে লীন হইতেছে তাহা দেখিতে চেষ্টা কর। কোথা হইতে শ্বাস আকৃষ্ট হইতেছে, কোথা হইতে শ্বাস প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহা সন্ধান রাখ, স্থিরচিত্তে একটী শ্বাস আকর্ষণ করিয়া কোথায় সে যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনকে চালাও। একেবারে পারিবে না, বার বার চেষ্টা কর বার বার শ্বাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনকে ছুটাইতে যত্নবান্ হও। অব্যক্তের সন্ধানের জন্য তোমার এই যত্ন; সুতরাং সেই অব্যক্তের শরণাগত হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হও। বিফলতা যত আসিবে, তত সেই অব্যক্তকে ডাকিতে থাক। অব্যক্ত স্বীয় আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে, যাহাতে তোমায় টানিয়া লয়, যাহাতে তোমার শ্বাস তোমায় ফেলিয়া না যায় তাহার জন্য প্রার্থনা কর। শ্বাসের সঙ্গে তুমি যাইতে না পার, অন্ততঃ তোমার সে কাতর আহ্বান যাহাতে যায় তাহার জন্য সচেষ্ট হও। ক্রমশঃ দেখিবে তোমার সে কাতর আহ্বান অব্যক্তে পৌছিয়াছে।

তোমার সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর স্বরূপে অনাহত নাদ তোমার কাণে পৌঁছিতেছে,—মা তোমায় ডাকিতেছেন। তখন আশ্বাস পাইবে, সাহস ও বল পাইবে, তখন শ্বাসের সঙ্গে অব্যক্তে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে। আর শুধু তখন ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে যাইতে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আসিতে তোমার শোকের কারণ কিছু থাকিবে না। ইহারই নাম সহজ প্রাণায়াম বা অজপা।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত—

এই অব্যক্ত হইতে মা আপনি ব্যক্ত হয়েন। জগতে শুনিতে পাই, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে, অব্যক্তের সন্ধান পাওয়া যায় না; পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান কখন কাহারও হইয়াছে কি না জানি না। পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তৎপরে অব্যক্তের সন্ধান লাভ করিতে হইলে, জগতের জীবের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। যে পূর্ণত্বের অধিকার মহেশ্বরের অবধি হয় নাই, সে পূর্ণত্ব জীবের কল্পনাতেই আসে না। তবে কল্পনার গণ্ডীর ভিতর যতটুকু পূর্ণ থাকে, ততটুকু পূর্ণজ্ঞান বলিলে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের কথাটা কতকটা যুক্তি সঙ্গত হয়। যাহা হউক, সাধকের সাধনা ঘণীভূত হইলে সে অব্যক্ত সমুদ্রে তরঙ্গের হিল্লোল খেলিতে থাকে; অব্যক্তরূপিনী মা আমার ব্যক্ত হইবার জন্য অধীরা হয়েন। তখন আমি দেখিব, মা আমার অজ্ঞাতে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার শিয়রে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। অব্যক্ত ও ব্যক্ত একই হইয়াছে। আদি, মধ্য ও অন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত লইয়া শোক ও বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই।

"জাতস্যহি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেঽর্থেন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥"

গীতা ২।২৭।২৮

এই জ্ঞানের সাধনের পরে "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ইত্যাদি জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। জাত মাত্রেরই মরণ সুনিশ্চিৎ, মৃত মাত্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী এই ধারণাটী চিত্তে বদ্ধমূল হইলে, তখন কোথা হইতে জন্মিয়াছি ও মরণের পর কোন ক্ষেত্রে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব, সেই ক্ষেত্রের সন্ধানে প্রাণ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন প্রাণ সেই অব্যক্ত কেন্দ্রের দিকে প্লাবিত হইতে থাকে। 'অব্যক্ত' 'অব্যক্ত' করিয়া প্রাণ আকুল হয়, এবং তখনই অব্যক্তের নিত্য সনাতন স্থির অভ্যাসে হৃদয় শান্তিপূর্ণ হয়। আসা যাওয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে কোথা হইতে এ আসা যাওয়া তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। সাধক যখন এই প্রকারে অব্যক্তের সন্ধান পায়, তখন তাহার তৃতীয় চক্ষু (দিব্য চক্ষু) উন্মেষিত হয়—সেখানে যে জগৎ দেখিতেছিল, সেইখানে 'জগৎ' মাতাকে' পরিদর্শন করে। মায়ার চিত্র না দেখিয়া মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি প্রকটিত হইতে দেখে।

'মরণ' অর্থে 'নবজাগরণ'—

আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিতেছি। আমরা একটু প্রাণ ব্যয় না করিলে সুখের সন্ধান পাই না। মূল্যস্বরূপ প্রাণ না দিলে কেহ আমাদিগকে সুখ দেয় না। ভাবের দ্বারা যে কল্পনা সুখ অনুভব করি, তাহাতেও

প্রাণ ব্যয়িত হয়, তাঁহাতেও একটু মরিতে হয়। মুগ্ধ হওয়া অর্থে মরণ। মরণ অর্থে নবজাগরণ, নবজন্মের উপাদান সংগ্রহ। একতিল মরিলে, এক তিল আনন্দ পাই, তখন পূর্ণভাবে মরিলে পূর্ণানন্দ পাওয়া যাইবে। পূর্ণভাবে মরিতে যে পারে সে আর মরে না,—মৃত্যুঞ্জয় হয়, পূর্ণভাবে মরিয়াছে অর্থে পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়াছে। মৃত্যু সাধনায় যে যত পারদর্শী, সে সেই পরিমাণে মৃত্যুঞ্জয় হয়, সে সেই পরিমাণে আনন্দস্বরূপ হয়। সাধক! মরণের সাধনা কর; উহাতেই চিদানন্দ স্বরূপ হইবে। মরণের সাধনা কর; তোমার সমস্ত পরমাণু নব জাগরণে জাগ্রৎ হইবে। সাধক এই মরণে জাগে। সাধারণ জীব মরণে নিদ্রিত, পূর্ব্বাপর চিন্তাবিস্মৃত সাধারণ মনুষ্য মরণের নাম শুনিলে সে স্থান পরিত্যাগ করে। সাধু মরণের ধ্যানে অহর্নিশ বিভোর! শ্বাস-প্রশ্বাস যিনি ধ্যান অভ্যাস করেন, তিনি মরণে ভীত হ'ন না। সত্যই তিনি মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও অহরহঃ অব্যক্তের দর্শন পা'ন।

চৈতন্য-শক্তি—

একটা চৈতন্যশক্তি সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন ঐ চৈতন্যের অভিপ্রায় অনুসারেই জগতের সমস্ত কার্য্য নিয়মিত হইতেছে। ঐ চৈতন্যশক্তির বুদ্ধি বিবেচনা, আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার সহিত এক জাতীয়। ঐ চৈতন্য শক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা হইতেই ছায়ারূপে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা প্রতিফলিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাতে কোনও বিষয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইলে, আমরা যদি চৈতন্যময়ী পরাশক্তিকে তাহা জানাই, তবে বুঝিতে হইবে যে সেই সর্ব্বগতা

চৈতন্যশক্তির গায়ে একটি আঘাত লাগিয়াছে। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ আঘাত লাগিলে ঐ মহাশক্তি জাগরিতা হন। এইজন্য ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত ক্রমাগত প্রার্থনা করিয়া সেই নানা কৌশলময়ী চৈতন্যশক্তির নিকট প্রার্থনা সফল করান যায়। সেই অন্তর্যামিনী চৈতন্যরূপা কুলকুণ্ডলিনীর নিকট আপদে, বিপদে, পীড়নে, মরণে আমাদের সম্মিলিত আকুল প্রার্থনা উত্থিত হইলে, তিনি বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া সর্ব্বোত্তম উপায় বিধান করিতে পারেন ও চিরদিন করিয়া থাকেন।

প্রাণায়াম—

অজপাতে যে সকল ক্রিয়াপ্রকরণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই অন্তরস্থ বায়ুক্রিয়া। ঐ সকল বায়ুক্রিয়াই রাজযোগের কার্য্য। উহাতে একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও চিরশান্তি লাভের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এক্ষণে ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে কোন কোন চিকিৎসক সুদীর্ঘ শ্বাসগ্রহণের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। হিন্দু যোগিগণ উহাকেই প্রাণায়াম বা প্রাণবায়ুর বিস্তার বলিয়া যোগসাধনের সারতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন।

গৌতমীয় শাস্ত্রে আছে,—

"প্রাণায়ামং বিনা সর্ব্বং সাধনং নিষ্ফলং ভবেৎ।
প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্র পূজনে ন হি যোগ্যতা ॥"

অর্থাৎ প্রাণায়াম না করিয়া পূজাদি করা নিষ্ফল। প্রাণায়াম না করিলে পূজার অধিকারীই হওয়া যায় না। অজপা প্রাণায়াম করিয়া সর্ব্বকার্য্য করিবে।

শরীর রক্ষার্থে ব্যায়াম যেমন, প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণায়াম সেইরূপ। প্রাণবায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করাই প্রাণায়ামের সূত্র। ধীরে ধীরে

সুদীর্ঘ শ্বাস তুলিয়া আজ্ঞাচক্রে ক্ষণকালের জন্য স্পর্শ করিয়া আবার ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করিলে, ঐ অভ্যাসে হৃদয় প্রশস্ত প্রাণ পূর্ণ ও মন প্রফুল্ল হয়। শরীর মধ্যস্থ নানাবিধ রোগের জীবাণু সকল নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে কাশ্ রোগ, ক্রূর বায়ু, অজীর্ণ, ক্ষয়কাশাদি, প্লীহা, জ্বর, বার্দ্ধক্য ও অকালমরণের নিবারণ হয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের দিকে জোর রাখিতে অক্ষম, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মণের এই অমর ক্রিয়ার দিকে অগ্রসর না হ'ন। তাঁহারা শ্বাস স্থির রাখিতে ও তাহাতে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যাস করিবেন, তাহাতেই মনঃস্থির হইবে। দেহের ব্যায়াম ও ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম প্রতিদিন অভ্যাস করিলেই মহাযোগ সাধনের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত হইবে।

শ্বাসবায়ু ও চৈতন্য—

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

নিশ্বাস শ্বাস রূপেণ মন্ত্রোঽয়ম্ বর্ত্ততে প্রিয়ে।

"হে প্রিয়ে, নিশ্বাস শ্বাসরূপেই মুক্তির এই মহামন্ত্র জীব হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

বায়ুই জীবের আয়ু, বায়ুই জীবের বল, বায়ুই শরীরগণের বিধাতা, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব, এবং বায়ুই প্রত্যক্ষ দেবতা। সূর্য্যের যেরূপ অনন্ত কিরণ সেইরূপ পূর্ণব্রহ্মের বিমল কিরণই বায়ুমণ্ডলস্থ অনন্ত দেবশক্তি। অনন্ত কিরণ সমষ্টিই সেই 'পূর্ণব্রহ্ম'।

মরুৎ-ব্যোম, বাতাস ও আকাশ পরস্পর মিলিত। ঐ সূক্ষ্ম পর ব্যোম ও সূক্ষ্ম বায়ু একত্রে মানবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্নায়ু মণ্ডলে সর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ পরব্রহ্ম বা চিদাকাশ কেবল চৈতন্য ভিন্ন আর

কিছুই নহে। ঐ আকাশরূপী চৈতন্যই সকল জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার ও আশ্রয়। সেই মহাচৈতন্যই অন্তরস্থ সূক্ষ্ম বায়ুতে সম্মিলিত আছে। ঐ স্থির বায়ুই ঐ মহাচৈতন্যের বাস ভবন। সেই চেতনা বায়ু বাহ্য বায়ু মধ্যস্থ স্থির বায়ুতে থাকেন। তিনিই জীবাত্মারূপে শ্বাসপ্রশ্বাস পথ দিয়া হৃদয় মধ্যে একবার আসিতেছেন আবার হৃদয় মধ্যে সংযোগ রাখিয়া নাসিকার বাহিরে অনন্ত আকাশরূপী চৈতন্য সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। গাছের শাখা প্রশাখার ন্যায় এই শ্বাসপ্রশ্বাস আকাশ চৈতন্যের শাখা মাত্র। সম্মিলিত বাতাস ও আকাশ চৈতন্য যেন সমুদ্র, শ্বাসপ্রশ্বাস একটী খাল বা নদীর ন্যায় উহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। সাপ যেমন একটী গর্ত্তের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া থাকে, তেমনি ঐ আকাশ বায়ুস্থ 'চৈতন্যবুদ্ধি' জীবের নাসারন্ধ্রে আপন মস্তক প্রবেশ করাইয়া রহিয়াছেন। দেহস্থ এই শ্বাস আছে, তাই জীব আছে। শ্বাস গেলেই সেই সঙ্গে জীব চলিয়া যায়। বন্ধ করিলেই বুঝিতে পারি আমার জ্ঞানবুদ্ধি পথ বন্ধ হইল।

শ্বাস গেলেই চৈতন্য যায়—কোথায়? নাসিকার ঠিক সম্মুখেই অর্দ্ধাঙ্গুলির মধ্যেই অনন্ত আকাশ চৈতন্যে প্রবেশ করে। এই আকাশরূপী 'চৈতন্য বুদ্ধি' শ্বাসরূপে নাসিকাপথে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। ঘড়ির দোলকের ন্যায় শ্বাসের যে যন্ত্র বা পরিদোলক, তাহার গতির প্রতি মন দিয়া দেখ, উহার গতিবিধি কিরূপ, ভাবভঙ্গী কিরূপ? প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারা যায় যে শ্বাসের কলেই এই জীব সৃষ্টির কলকারখানা চলিতেছে। ঐ শ্বাসের স্থিরতাতেই একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি, উহাতেই পরম সুখ ও চিরশান্তি বিরাজিত। উহাতেই পূর্ণানন্দ ও সমাধি লাভ হয়। ঐ শ্বাস ও আকাশ চৈতন্য অখণ্ডিতভাবে মিলিত রহিয়াছে। আকাশই চৈতন্য রত্নের রত্নাকর।

"হে আকাশ চৈতন্যময় তোমার বিশ্ব আর কারো নয়।
সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে চেয়ে আছে স্থির নয়নে॥
যে তোমারে অন্তরে নিয়ে ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে,
সব অভাব তার গেছে ধুয়ে স্পর্শমণি তোমায় ছুঁয়ে।"

শ্বাস চৈতন্য ও বিরাট্ চৈতন্য—

সমুদ্র তীরের দশহাতজল মাটীর কোলে থাকিয়া মনে করে "আমি তীরস্থ একটু সামান্য জলমাত্র। ওঃ সমুদ্রবারি কি অনন্তঃ কি গভীর, অতল-স্পর্শ! মহাসমুদ্র কি বিশাল ও মহান্।" সেইরূপ মাটীর কোলে থাকিয়া আমরাও মনে করি "আমি ক্ষুদ্র জীব, কীটানুকীট, সামান্য একটু শ্বাস মাত্র; তাহা গেলেই গেলাম। ওঃ, বায়ু কি অনন্ত। আকাশ কি বিশাল অসীম অতলস্পর্শ, ব্রহ্মচৈতন্য কি গম্ভীর ও মহান্।" কিন্তু সমুদ্রতীরস্থ দশহাত জলও যেমন সমুদ্র জল; সেও যেমন সমুদ্র বৈ আর কিছুই নহে—উহা অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিলেই যেমন সমস্ত সমুদ্র স্পর্শ করা হয়; সেইরূপ আমাদের নাসিকাস্থ শ্বাসপ্রশ্বাসও সেই অনন্ত আকাশের অখণ্ড বায়ু মণ্ডল। 'প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত'—(ঋগ্বেদ) অর্থাৎ প্রজাপতির প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছিলেন।

অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈত স্থানমবষ্টভ্য বিধারয়ামিতি

(প্রশ্নোপনিষদ)

অর্থাৎ প্রাণ বলিতেছেন আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক এই শরীর ধারণ করিয়া আছি।

ঐতরেয়োপনিষদে দৃষ্ট হয়, ঐ বায়ুই প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিয়া ছিলেন—যথা

"প্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রবিশদাদি।"

(ঐতরেয়োপনিষদ)

শ্বাসের অন্তঃভাগই সেই মহাকাশের ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অখণ্ডিত-ভাবে চির বর্ত্তমান। এই শ্বাসস্পর্শ করিলেই ব্রহ্মকে স্পর্শ করা হয়।

স্থির ও চৈতন্য প্রাণ—

শ্বাসের স্থিরতাতেই সেই চিরশান্তিময় 'স্থির চৈতন্য' কিংবা 'পূর্ণব্রহ্ম' বিরাজিত। পাঠক বেশ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, সত্যই এই শ্বাসের স্থিরতাতেই আত্মদর্শন লাভ হয়।

"প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥"

"প্রাণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। প্রাণেতেই সকল সৃষ্টি ধৃত রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ প্রাণময়।"—যোগশাস্ত্র।

প্রাণের আয়াম=প্রাণায়াম। আয়াম অর্থে বিস্তার। আমার এই পুঁটি মাছের প্রাণটা আকাশময় 'মহাপ্রাণ'কে দেখিতে পাইলে আকাশ জোড়া হইয়া পড়ে; আর মৃত্যুভয় থাকে না। তখনই মৃত্যুর মৃত্যু হয়। তাই শ্বাসে দৃষ্টি রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে প্রথম হইতে উপদেশ দে'ন। শ্বাসে দৃষ্টি দিতে দিতে ক্রমে সাধক ঐ শ্বাস দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। তখন তিনি অমৃতের আভাস প্রাপ্ত হ'ন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে অজরত্ব, অমরত্ব অনুভব করেন।

লোকে বলে গীতা ও প্রাণায়ামাদি যোগতত্ত্ব প্রকাশ করিতে নাই। সে সত্য কথা, কিন্তু মুখে বলিলে বা কাগজে ছাপিলে গুপ্ত বিষয় প্রকাশিত হয় না। গীতা বলেন, "গোপনীয় হ'তেও গোপনীয় অতি" ইহা চির গুহ্য শাস্ত্র ; সহস্রবার মুখে বলিলেও, অজিতেন্দ্রিয়, ও অবিশ্বাসী সাধারণ লোক ইহা বুঝিবে না ও মানিবে না। বাজারে বিক্রয় হইলেই বা ক্ষতি কি? যে ধরিবার, সেই মাত্র ধরিতে পারিবে। বীজগণিত, রসায়ন বিদ্যা, ও জ্যোতিষের ন্যায় এই বিদ্যা সাধারণের মধ্যে কোনও কালে প্রকাশিত হইবে না। বৃহৎ বেড়া জালে কেবল রুই কাৎলাই উঠিয়া থাকে, আর সব মৎস্য ফাঁকে ফাঁকে বাহির হইয়া যায়। এই বিদ্যাজালে কেবল সাধু স্বভাব ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ বদ্ধ হইবার অভিলাষী হয়েন।

গুরুকৃপা বিশ্বাস—

এই অজপা সাধনে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুই নাই। ইহার সাধন সকলেই করিতে পারেন। গুরুপদে প্রাণমন অর্পণ করিয়া অজপা অভ্যাস করিতে পারিলেই চিরশান্তি লাভ করিতে পারা যায়। দিনরাত্রে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, সারারাত্রি নিদ্রায় না কাটাইয়া নিশীথ

"গুরু প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ ॥"

শিবসংহিতা ৩।৩০

গুরু যদি তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে নিখিল শুভ ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। সুতরাং সর্ব্বদাই গুরুসেবা করা বিধেয়। গুরু সেবা ব্যতীত কদাচ শুভ ফল প্রত্যাশা করা যায় না।

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"গুরুকৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তি লতাবীজ।"

গুরু কৃপা না হইলে কৃষ্ণ কৃপার আশা সুদূর পরাহত।

কালে দুই তিন ঘণ্টা অভ্যাসেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই নিভৃত সাধনই 'গিরি গুহার' সাধনা এই সাধনই স্বয়ং শান্তি। এই বিদ্যা কেবল ঐকান্তিক গুরু সেবার দ্বারাই লভ্য। উচ্চশিক্ষা মাত্রেই সৎশিক্ষকের আবশ্যক। বিশ্বাস, ভক্তি শ্রীগুরু পাদপদ্মে অর্পণ করিতে না পারিলে ইহা লাভ করা যায় না। ইহা ফাঁকি দিয়া লাভ হয় না, কিংবা পড়িলেই লাভ হইবে না। ইহা গুরু কৃপাপূর্ব্বক অর্পণ করিলে অবশ্যই লাভ হইবে।

ইহার দক্ষিণা ও প্রণামী "বিশ্বাস" তাহা সাধককে দিতেই হইবে। একটী উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল। এক ব্রাহ্মণী চুল্লীতে ডাল চড়াইয়া দিয়া জল আনিতে গিয়াছেন। যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে দেখিতে বলিয়া গিয়াছেন। ডাল বারম্বার উথলিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই থাকে না; বহু চেষ্টা করিয়া পরে ব্রাহ্মণ চণ্ডী আনিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, তত্রাপি ডাল উথলিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ অজপা ধরিল, তথাপি ডাল

চৈতন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়।"

মধ্য ২২।৬২

এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও নিশ্চয় হইলেই সাধনা পথের উত্তম অধিকারী হওয়া যায়।

সুতরাং তিনি আবার বলিয়াছেন—

শাস্ত্রযুক্তে সুনিপণ দৃঢ় বিশ্বাস যার।
"উত্তম অধিকারী" সেই তারয়ে সংসার।

মধ্য ২২।৬৫

উথলিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ডাল সমস্যা লইয়া অস্থির হইয়াছেন, কোন মতেই থামাইতে পারিতেছেন না। ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণী আসিয়া ব্রাহ্মণের চণ্ডীপাঠ ধ্যান ধারণা দেখিয়া হাসিয়া একটু সরিষার তৈল দিবা মাত্র ডাল সুস্থির হইল। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন ব্রাহ্মণী স্বয়ং দেবী।

এই ক্ষুদ্রগল্পে বিজ্ঞানের কি সুন্দর উদাহরণ দেখান হইয়াছে। ভিত্তিতে স্থাপিত না হইলে চণ্ডী পাঠে "একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও চিরশান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।" কিংবা শ্রীগুরুরপাদপদ্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে অজপা অভ্যাসেই আত্মদর্শন কিংবা মাতৃ সাক্ষাৎকারের, কিংবা ব্যাধি মুক্ত হইতে বিলম্ব ঘটে। বিজ্ঞানে পারদর্শী হইলেই লোক দেবতা হয়। যোগীঋষিগণের মনোবিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞান কল্পনা নহে। এই ডালের উচ্ছ্বাসে তৈল দান যেরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, শোক দুঃখের ঐকান্তিক উচ্ছ্বাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অজপা সাধন করিলে শান্তিদেবী সেইরূপ প্রত্যক্ষীভূতা হ'ন।

যেমন কৌশলে ধরি' কোন এক যন্ত্রে পুরি'
বাষ্পকে বরফ করা যায়;
তন্ত্রে চিৎ বস্তু ধরি, ক্রিয়াযোগে যন্ত্রে পুরি'
মন্ত্রে তারে প্রত্যক্ষ করায়॥

'আমি'—

যাঁহাদের চিত্ত কেবল কামিনী কাঞ্চনের সুখেই আবদ্ধ, তাঁহাদের অজপা সাধন বৃথা। তাঁহাদের পুনর্জন্ম ঘটে, অন্যের নহে। "যেমন মতি, তেমন গতি।" একটা প্রকাণ্ড 'আমি'—আকাশ জোড়া একটা 'আমি' আছে। গাছের যেমন পল্লব বাহির হয়, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির যেমন

শিখা বাহির হয়, গঙ্গার যেমন শাখা বাহির হয়, সেই রূপ প্রকাণ্ড আকাশজোড়া 'আমি'র প্রশাখা চারিদিকে বাহির হইয়াছে। ঐ আকাশ জোড়া মহাগ্নির শিখা, সর্পের জিহ্বার ন্যায় লক লক্ করিতেছে; এবং জীবের নাসিকার মধ্যে আসা যাওয়া করিতেছে। উহাই জীবের 'আমি'। উহা গেলেই 'আমি' গেল। আকাশরূপিণী, আকাশবাসীনী চৈতন্যময়ী, মহাশক্তি মহাদেবী। তিনি সূক্ষ্মাকাশে বিরাজিতা। বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক ও পিতৃলোক প্রভৃতি সমস্তই সূক্ষ্মাকাশে বর্ত্তমান। তত্ত্বজ্ঞ আমি দেহ ছাড়িয়া শ্বাস মধ্যস্থ মনোরূপী হইয়া যেইমাত্র আকাশে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার দেহের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, মন একেবারে চিৎ বা চৈতন্যভাবাপন্ন হইবে। তখন 'আমি' যে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিব, তাহা মহা সৌন্দর্য্যে, মহাস্ফূর্ত্তিতে, পূর্ণ হইবে।

দেবতা ও চৈতন্য—

শুদ্ধ চৈতন্যময় দেবতা সকল ঐ মনে সহজে প্রতিফলিত হইবে। যিনি সূক্ষ্মতম অখণ্ড মহাচৈতন্য, সর্ব্বমূলাধার, তাঁহাকেও সহজে দেখা যাইবে। মহাকাশ দর্পণ অপেক্ষাও স্বচ্ছ, স্বচ্ছতম। সেই আকাশময় অখণ্ড শুদ্ধ চৈন্যই সকল বুদ্ধি, সকল জ্ঞানের উৎস। এই চৈতন্য হইতে যে সকল বড় বড় "বুদ্ধিমান" স্ফটিকগৃহে স্ফটিকপুত্তলিকাবৎ আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছেন, তাঁহারাই দেব দেবী—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শক্তি প্রভৃতি। আর তদপেক্ষা অল্প শক্তিমান যে সব বুদ্ধিতে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব উদিত হইতেছে, তাহারাই মনুষ্য। তাহারাই ঐ বড় বড় জ্ঞান বুদ্ধির চিন্ময় ছবিকে উপাসনা করিয়া মহাশক্তির দিকে চলিতেছে। পরে নদী যেমন সাগরে পড়ে, সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্যে

গিয়া মোক্ষ, মুক্তি বা পূর্ণ শান্তি লাভ করিতেছে। ইতর প্রাণী, ও বৃক্ষলতাদির মধ্যেও আপন আপন যে সামান্য জীবভাব আছে, সেই জীবভাবও আপন আপন উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া কালে কালে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে; এবং শেষে আকাশময় মহা চৈতন্যে মিলিত হইতেছে।

চৈতন্যরূপিণী মা

চৈতন্যরূপিণী বিশ্বজননী—

ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীই চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি। সেই মহাদেবী মোক্ষদায়িনী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি মা আমাকে ও তোমাকে, জগতের সকলকে জননীর ন্যায় ঊর্দ্ধ্ব হইতে ঊর্দ্ধ্বে তুলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন। তিনিই তো একবার "মা জননী" হইয়া এই জড় জগতে আসিয়া আমাকে হৃদয় দুগ্ধ পান করাইয়াছেন, নতুবা আমার জড়দেহধারিণী জননী সেই মাতৃদুগ্ধ কোথায় পাইবেন? তিনি তো উহার সন্ধান জানেন না। সেই চৈতন্যময়ী 'মা জননীই' তো এই মায়ের মধ্যে বসিয়া থাকেন। অন্ধ চক্ষু কিছুতেই দেখিতে পায় না।

"হাতে পাতে দই,
তবু বলে কই।"

আমাদেরও সেই দশা। হায় হায়, আমরা মাকে চিনিতে পারিলাম না।

"মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডসম তিনি বিদ্যমান।
আঁধারে জগৎ অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ॥"

মাগো—"জন্মিলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ দিয়াছিলে,
সে দয়ার কথা যেন নাহি যাই ভুলে॥"

মৃত্যুর জন্যই বা চিন্তা কি ? মাতৃক্রোড় যে অমৃত।

"মরিলে অমৃত কোলে তুলে লবে কে ?
জন্মিলে অমৃত দিল মাতৃস্তনে যে ॥"

মায়ের অভয়বাণী—

তবে আর চিন্তা কি ? ঐ যে মা জননী এখনও কোলে লইবার জন্য নাসিকার সম্মুখে, অখণ্ড আকাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ যে মা আমাকে ডাকিতেছেন, ঐ যে তাঁহার 'মা ভৈঃ, 'মা ভৈঃ' রব চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "ভয় নাই, ভয় নাই", মা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন আর ডাকিতেছেন। সাধুরা, সাধকেরা, ভক্তগণ শুনিতেছেন—কিন্তু হায় অবিশ্বাসী, নরাধমের বধির কর্ণ কিছুই শুনিতে পায় না। হায় অন্ধ চক্ষু দেখিতে পায় না। একি বধিরতা! একি ঘোর অন্ধতা। মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণেও মাকে দেখিতে পাইতেছে না। সূর্য্যালোক ত ফুরাইয়া আসিল। মনরে, তবে সেই মহাশক্তির মহামায়ার শরণাপন্ন হও। 'মা' 'মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাক ; মা দর্শন দিবেনই দিবেন।

"এইরূপে আমাতে হ'লে সমাহিত মন,
নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দরশন।"

গীতা— ৯।৩৪।

"দেহাভিমান পাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহম্ জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥"

অষ্টাবক্রসংহিতা ১।১৪

এই খড়্গাই চিরদিনই মায়ের হাতে রহিয়াছে। মায়ের এই খড়্গোই ত মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভাদি বধ হয়। চণ্ডীতে আছে, "আবার শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দৈত্য জন্মিবে, আবার আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" মা তো চিরদিনই এই খড়্গে অসুর নিধন করিতেছেন। রিপুসংহারী যে অমৃতের সাগর! উহাই একমাত্র 'মুক্তির পথ'। এস সাধকগণ, এস ভক্তগণ, এস ভ্রাতৃগণ আমরা সকলে অজপা সাধন অভ্যাস করিয়া নির্জ্জনে অহরহঃ পূজা করি। আর জগজ্জননী ব্রহ্মময়ীর ক্রোড়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া মা হারা সন্তানের মত 'মা' 'মা' বলিয়া বাহু তুলিয়া ডাকি। অচিরেই সেই অন্তরবাসিনী, অজপারূপ-ধারিণী মহাশক্তির কোলে স্থান পাইব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মায়ের নিঃশ্বাস।

"শ্যামা নয় সামান্যা মেয়ে,—
সে যে মূলাধারে সহস্রারে উঠছে ধেয়ে ধেয়ে।"

সাধক যখন প্রতি কর্ম্মে মাতৃপ্রেরণা মাত্র দেখিতে পায়, তখন ধীরে ধীরে এই অম্বিকার নিঃশ্বাস রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত আমার নহে, উহা মায়ের। মা আমার অন্তরে প্রাণময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছেন; তাহারই বহির্লক্ষণ—শ্বাস প্রশ্বাসরূপ

হে পুত্র, তুমি দেহভিমানরূপ পাশে চিরবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। "আমিই জ্ঞান স্বরূপ এই প্রকার জ্ঞান অসি দ্বারা ঐ পাশ ছেদন করতঃ প্রকৃত সুখে সুখী হও।

"জ্ঞানখড়্গে সংশয়কে খণ্ড খণ্ড করি,
ধর কর্ম্ম-যোগ, উঠ পাণ্ডব কেশরী॥"

গীতা

প্রাণন ক্রিয়া। সামান্য বায়ু প্রবাহ বলিয়া আমরা যাহাকে উপেক্ষা করি, উহাই যে মাতৃনিশ্বাস। ওগো, তোমরা মাকে অন্বেষণ করিতে কোথায় ধাবিত হও? দেখ চাহিয়া—তোমার নাসাপুট হইতে যে প্রাণন ক্রিয়া হইতেছে, সেই তো মায়ের সত্তা বলিয়া দিতেছে। ঐ যে মা, ধর উহাকে। উহারই গতি লক্ষ্য করিয়া মা মা বলিয়া ডাক। মায়ের সন্ধান পাইবে, মা ধরা দিবেন। বিনা রোধে বায়ু কুম্ভকে স্থির হইয়া যাইবে, চিন্তা চাঞ্চল্য দুরীভূত হইবে; যথার্থ স্থৈর্য্য ও আনন্দের আশ্বাদ পাইয়া জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

নিঃশ্বাসগুলি যে মায়ের ইহা বুঝিবার উপায় কি? যে নিঃশ্বাস মায়ের, তাহাতে কিছু না কিছু মাতৃচিহ্ন থাকিবেই। ঐ চিহ্ন—মাতৃনাম, প্রণবাদি মন্ত্র। শ্বাস প্রশ্বাসের জপ যাহাদের অভ্যাস হইয়াছে, তাহাদের ঐ জপই আসুরিক বৃত্তি দমনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

আত্মসমর্পণ—

আর একটা কথা; নিঃশ্বাসকে মাতৃনিঃশ্বাসরূপে উপলব্ধি করাই যথার্থ আত্মসমর্পণ। আমার বলিতে কিছুই যে নাই; নিঃশ্বাসটা পর্য্যন্ত যে মায়ের। আমার 'আমিই' যে স্বয়ং মা। আমার আমিরূপে তিনিইত নিত্য বিরাজিত। আমিরূপী তাঁহারই নিঃশ্বাস, এই নাসাপুটে প্রবাহিত হইতেছে। অহো আমিত্বের এই উপলব্ধিতে কি আনন্দ।

এই রকম উচ্ছ্বাসের কথাই অষ্টাবক্র সংহিতায় আছে

"অহো! অহং নমো মহ্যং
বিনাশো নাস্তি যস্য মে।"
"অহো! আমি অবিনশ্বর।
সেই আমাকে আমি নমস্কার করি।

আমিত্বের লয়—

ওগো অমৃতের পুত্রগণ! একবার এই সত্য উপলব্ধি কর। তোমার পায়ের নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত, কি সুখময়, অমৃতময়, মধুময় স্পর্শে সঞ্জীবিত পুলকিত হইয়া উঠিবে! সে আনন্দ এত মহান্, এত অপার যে ধরিয়া রাখিবার স্থান নাই। একবার দেখ দেখি, তোমার আমিটাই মা একবার অনুভব কর দেখি, তোমার এই নিঃশ্বাস গুলি তোমার নহে, তোমারই অন্তরস্থ তাঁর। দেখিবে আমিত্ব কোথা পলায়ণ করিয়াছে। যে আমিত্বকে লয় করিবার জন্য কত জন্মব্যাপী প্রাণপাত কঠোর তপস্যা, সেই আমিত্বের লয় কত সহজে নিষ্পন্ন হইয়া যায়। বিশ্বাস কর, মা ভবানীই এই গূঢ় রহস্য তাঁর প্রিয় সন্তানগণের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন; ইহা যেন অনাদৃত উপেক্ষিত ও বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা না লাগে।

যতদিন নিঃশ্বাস গুলিতে আমার বলিয়া অভিমান থাকে ততদিনই উহারা নির্বীর্য্য। পরন্তু পলে পলে মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত করিবার চেষ্টা করে। আর যখন মাতৃ নিঃশ্বাসরূপে প্রতীতি হইতে থাকে, তখনই উহারা মাতৃশক্তিতে শক্তিমান হইয়া, অমিতবীর্য্যে অসুর সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অমরত্বের সন্ধানে ধাবিত হয়। ইহা শুধু ভাষার ঝঙ্কার নহে। সত্যই নিঃশ্বাসগুলিকে মাতৃনিঃশ্বাস বলিয়া বুঝিতে পারিলে, আসুরিক বৃত্তির দমন এবং মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়। ইহা বহুবার পরীক্ষিত ধ্রুব সত্য।

চৈতন্যময় জপ—

সে যাহাই হউক নিঃশ্বাসগুলি যে মায়ের তাহা বুঝিবার উপায়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"জপ"। মৃত জপ নহে, চৈতন্যময় জপ, চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র জপ। ঐ জপ করিতে হয় না, আপনি হয়। শ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ চেষ্টা করিয়া করিতে হয় না, ইহাও সেইরূপ বিনা চেষ্টায় নিষ্পন্ন হয়। একদিনে না হইতে পারে, প্রথম কয়েক দিন একটু যত্নের সহিত অভ্যাস করিলেই জপ স্বাভাবিক হইয়া যায়। আত্মসমর্পণ এবং মন্ত্রচৈতন্য উভয়ের সার্থকতা এই মাতৃনিঃশ্বাসের উপলব্ধিতেই সর্ব্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে সর্ব্ববিধ সাধনায় আত্মসমর্পণ ও মন্ত্রচৈতন্যই মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই দুইটী মূলধন লইয়া অবতীর্ণ হইলে, সকল সাধনাই অচিরে সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

অজপা অর্পণ—

সন্ন্যাসীগণও আত্মসমর্পণ সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য অজপা অর্পণরূপ একটী অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহার সারমর্ম্ম এইরূপ—"আমরা অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয় শত অজপা অর্থাৎ "হংস" মন্ত্র জপরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। উহাই আমার আমিত্ব। বাস্তবিকই জীবভাবীয় আমিত্বকে একটু সূক্ষ্ম দেখিতে গেলে, কতকগুলি শ্বাসপ্রশ্বাসের সমষ্টি মাত্র পাওয়া যায়। ঐ সমষ্টি সংখ্যা কতিপয় অংশে বিভক্ত করিয়া, গুরু, গনেশ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে হয়। এইরূপে সমস্ত অর্পণ করিয়া, আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; সুতরাং আমি বলিয়াও আর কিছু রহিল না। শেষে একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম সত্তাই রহিয়া গেল। এই অনুষ্ঠানটী অনেক স্থলেই মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। মাত্র এইরূপ কয়েকটী

মন্ত্র পাঠের দ্বারা কতদিনে যে আমিত্ব লয় হয়, তাহা বলিতে পারি না। তবে এইরূপ মাতৃনিঃশ্বাসের উপলব্ধিতে যে অচিরেই আমিত্বের লয় হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

আমিত্ব লয় শব্দে কেহ এমন মনে করিও না যে "আমি থাকিব না।" মনে রাখিও "বহু আমি" বাস্তবিক নাই। 'এক আমিই' মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতে গিয়া, 'বহু আমির' ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐ অজ্ঞানকল্পিত আমিত্বকে বিলয় করিতে পারিলেই, আমির প্রকৃত স্বরূপটা ধরা পড়ে, এবং যাহা যথার্থ আমি, যিনি এক আমি সেই আত্মা—মা আমার—নিত্যই যে প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি যোগ্য হইয়া থাকে।

দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযোজ্ঞ ও স্বাধ্যায় জ্ঞানযোগ—

ভগবদ্গীতোক্ত দ্রব্য যজ্ঞাদিও এই আত্মসমর্পণেরই ক্রম মাত্র। জীবের যখন একটু একটু করিয়া ভগবৎ সত্তায় বিশ্বাস আসিতে থাকে তখন হইতে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ—ভগবৎ উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি অর্পণ হয়, আমিকে অর্পণ করিবার ইহাই পূর্ব্ব লক্ষণ। এইরূপ কিছু দিন করিবার পর, জীব আর মাত্র দ্রব্য অর্পণ করিয়া তৃপ্তি পায় না। একটু একটু সাধন ভজন করিতে থাকে, উহার নাম তপোযজ্ঞ। ইহার উদ্দেশ্য আমিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা। যখন দেখিতে পায় আমি বড় মলিন—অতিশয়

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞা স্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযোজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
গীতা ৪।২৮

বিষয়াসক্ত, এ অপবিত্র আমিকে লইয়া, সে পরম পবিত্রের চরণে অর্পণ করা যায় না; তখনই তপস্যার দ্বারা আমিকে পবিত্র করিতে প্রয়াস পায়। একটু পবিত্র হইলে তবে যোগযজ্ঞের অধিকার হয়। তখন ভগবানের সহিত যোগ রাখিয়া যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করিতে থাকে। এ অবস্থায়েও আমিটা পৃথক থাকে। কিছু দিন ভগবানের সহিত মিলন বা যোগ সংঘটিত হইলে, ভালবাসা, আশক্তি বা ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তি যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রেমে পরিণত হয়—তখনই সাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ স্বরূপের অধ্যায় বা উপলব্ধি হয়। এইরূপে আত্ম সাক্ষাৎরূপ মহাজ্ঞান অধিগত হইয়া থাকে। প্রেমে আত্মহারা হওয়ার নামই যথার্থ আত্মদান। এইরূপ আত্মদানের নামই আমিত্ব-বিলয়। ইহাই

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

মন্ত্রের চরম সার্থকতা।

আত্মসমর্পণের লক্ষণ—

ভাবিও না এইরূপ আত্মদান করিতে পারিলেই আর কখনও জীবভাবীয় আমিত্বের স্ফুরণ হইবে না। ভগবান্ তোমার আমিকে আবার তোমাকেই ফিরাইয়া দিবেন। তিনি একবার একবার তোমাকে আত্মহারা করিয়া, আপন বুকে মিলাইয়া লইবেন, আবার তোমার আমি তোমাকেই ফিরাইয়া দিবেন। তখন সে আমি অতীব সুন্দর! বড় পবিত্র! বিন্দুমাত্র অভিমান নাই বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। তখন সে 'আমি' সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তখন সে শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মই করুক, অথবা নৈষ্কর্ম্ম্যই অবলম্বন করুক সকল অবস্থাতেই ভগবৎশক্তি বিকাশের যন্ত্ররূপে পরিচালিত হইতে থাকে। ইহাই আত্মসমর্পণের চরম লক্ষণ।

যোগ ক্রিয়া শেষে হয় অবস্থা সুন্দর
'পরাবস্থা' বলে তারে অতিমোনোহর।
যোগে পরাবস্থা লভি, থাকে ব্রহ্ম সহবাসে,
'পরাবস্থার পরবস্থা' ধীরে শেষে নেমে আসে।
'তৃতীয় অবস্থা' সেই—আসক্তি আসিতে নারে,
সৃষ্টিকর্ম্ম—পূর্ণব্রহ্ম জেগে থাকে একাধারে।
'পরাবস্থার পরাবস্থা' জীবন্মুক্ত ভাব সেই
সম্পূর্ণ সমাধি ভঙ্গে সাধুদের ভাব এই ॥

(তপোবন)

অজপার ফল—

নিঃশ্বাস যখন মাতৃনাম হয়, অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র জপময় হইয়া, মাতৃনিঃশ্বাসরূপে উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন সর্ব্বরকম ব্যাধি নষ্ট করে, এবং সকল বাঞ্ছা পূরণ করে। ইহা শিবের বচন। ইহা মাতৃ আদেশ। সাধকের ভক্তি ও বিশ্বাস ইহার একমাত্র মহৌষধ। কর্ম্মফল খণ্ডন করিবার একমাত্র উপায় 'অজপা অভ্যাস' ইহা স্মরণ রাখিও।

সাধক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিও। তোমার চিত্ত যখন নানারূপ বৈষয়িক চিন্তায় বিব্রত হয়—আসুরিক ভাবগুলি যখন একটার পর একটা আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে, যখন তোমাকে রোগের জ্বালাতে সমস্ত রাত্রি জাগ্রত রাখে, যখন তুমি জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে কোনরূপে সুস্থির

হইতে পার না, যখন তুমি দৈব বিপাকে কর্ম্মফলে প্রপীড়িত হইয়া অসীম কষ্ট ও যাতনা অনুভব কর, তখন তুমি স্বভাবের উপর যে নিশ্বাস উঠিতেছে ও নামিতেছে সেই নিঃশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করিও। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জপ করিবে, আর ধারণা করিবে যে তোমারই মায়ের নিঃশ্বাস কিংবা রাধাকৃষ্ণ কিংবা সীতারামের নিঃশ্বাস তোমার নাসাপুট দিয়া যাতায়াত করিতেছে। দেখিবে—অনতিবিলম্বে তোমার সকল জ্বালা যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছ। এ সকল ক্রিয়ার ফল তৎক্ষণাৎ সাধক বুঝিতে পারিবে।

মন্ত্র চৈতন্য—

যাহা মনন করিলে পরিত্রাণ লাভ ঘটে তাহাই মন্ত্র। ইষ্ট দেবতা মন্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ইষ্টদেবতা ও মন্ত্র একই জিনিষ। আবার গুরু যিনি মন্ত্রদাতা তিনি ও মন্ত্র একই। গুরুকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি যে প্রেমভক্তি তাহাই মন্ত্রের জীবনী শক্তি। অতএব মন্ত্র, গুরু ও ইষ্টদেবতা প্রকৃতপক্ষে তিনেই এক এবং একেই তিন। সেইজন্য মন্ত্র—চৈতন্য করিতে হইলে এ তিনের ঐক্য ভাবনা করিতে হয়। মন্ত্র গুরু ও দেবতার একীকরণের নাম "মন্ত্র-চৈতন্য"। ত্রাণের জন্য যাহা মনন করা যায় তাহাই "মন্ত্র"। গুরুর প্রতি যদি দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকে এবং মন্ত্র তোমাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ এ ধারণা যদি না থাকে তবে মন্ত্র জপ নিস্ফল পণ্ডশ্রম মাত্র। মন্ত্র ত্রাণ করে; ত্রাণ যিনি করেন—ত্রাণের উপায়ও তিনি দেখান অর্থাৎ তিনিই গুরু ইহা বুঝা চাই—ইহাই মন্ত্রের শক্তি। ইহা ঠিক ঠিক অনুভূতির বিষয় হইলেই মন্ত্র চৈতন্য হয়।

শ্বাসের গতি ধরিয়া কর্ণবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক, অনাহত চক্রে গমন করিয়া

কিছুকাল অবস্থান করিতে পারিলেই পটহ, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঝিল্লী, ভেক, মেঘ, বজ্র ও ঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনিও শুনা যায়। সকল সাধকেরই একপ্রকার ধ্বনি শ্রবণ গোচর হয় না। প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যবশতঃ এই ধ্বনি শ্রবণেও বৈচিত্র্য হয়। তবে উল্লিখিত প্রকারের ধ্বনিগুলি অধিকাংশ সাধকই শুনিতে পান। এইরূপ অনাহতস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট নাদের সহিত যখন ইষ্টমন্ত্র মিলিয়া যায়, তখনই সাধক জপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ইহাই তান্ত্রিক মন্ত্র চৈতন্য। এই অবস্থায় আর চেষ্টা করিয়া জপ করিতে হয় না, স্বাভাবিক শক্তিবলেই জপ হইতে থাকে। এই নাদ যখন প্রকাশ পায়, তখন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়। সাধককে উন্মাদবৎ ছুটাইয়া লইয়া চলে। কোথাও কিছু নাই, অনবরত মৃদঙ্গধ্বনি, বংশীধ্বনি! সে ধ্বনি কি আকর্ষণময়। যেন প্রাণটাকে টানিয়া লইয়া চলে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, যাঁহার আকর্ষণে গোপিকাগণ কুল ছারিয়া অকুলে ভাসিয়াছিল। সত্যই গো, সে ধ্বনি কুল নাশক। মানুষকে—আনন্দে উন্মাদবৎ করিয়া তোলে। ঐ নাদের সহিত প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করিয়া লইলে, চিত্ত আপনা হইতে প্রশান্ত হয়; বৈষয়িক চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়—ব্যাধি দূরীভূত হয়।

তবে একটা কথা বলিয়া রাখি, কেহ উক্ত প্রকার ধ্বনি মাত্র শুনিবার জন্য অধ্যবসায় প্রয়োগ করিও না। উহা মাতৃ সাক্ষাতের অন্তরায়। মাতৃদর্শনের পথে অগ্রসর হইলে ঐ সকল আপনা হইতে আসিতে থাকে। তুমি মাতৃ আহ্বান শুনিবার জন্য কাতর প্রাণে উৎকর্ণ হইয়া, অনাহত কেন্দ্রে মনোনিবেশ কর; দেখিবে যথার্থ মায়ের আকর্ষণময় সুমধুর আহ্বান আসিতেছে। আর তুমিও সেই সঙ্গে

"যাই মা, যাই মা" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিতে থাক। সাধক, সকল সময়েই মনে রাখিও—"মাতৃলাভ আমার লক্ষ্য", পথিমধ্যে কত কি আসিবে যাইবে, সকলই দেখিব, সকলই শুনিব কিন্তু কোনটাতেই আসক্ত হইব না। ধ্বনি ত সামান্য কথা, নানারূপ যোগ বিভূতিতেও যেন মোহ না আসে।

ত্রিশূলের আধ্যাত্মিক অর্থ—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা,
ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।

গীতা ১৮।১৮

চণ্ডীতে তদ্‌পরে ত্রিশূলাঘাতে অসুর নিধনের উল্লেখ আছে। ত্রিশূল কি? ত্রিপুট জ্ঞান। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই ত্রিপুটীই ত্রিশূল পদবাচ্য। ইহা মহেশ্বরের অস্ত্র। ত্রিপুটীর সাহায্যে কিরূপে অসুর নিধন হয়? রূপ রসাদি বিষয়, কিংবা কামাদিবৃত্তি, যখন চিত্তক্ষেত্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, তখনই উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিপুটী প্রয়োগ করিতে হয়। বিষয় কিংবা বৃত্তিনিচয় যে ত্রিপুটী ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহা পুনঃ পুনঃ বিচারের সাহায্যে দৃঢ় ধারণা করিতে হয়।

আরও খুলিয়া বলিতেছি। মনে কর তুমি কোনও কমনীয় কান্তিতে মুগ্ধ। ঐকান্তিকে দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে থাক। এই যে কান্তি, ইহাই তোমার জ্ঞানের বিষয় বা **জ্ঞেয়**। আর 'তুমি জানিতেছ অতএব 'তুমি' **জ্ঞাতা**, এবং যাহা জানিলে তাহার নাম **জ্ঞান**। ইহারা একই জ্ঞানসমুদ্রের তিনটী তরঙ্গমাত্র। কি রূপ রসাদি বিষয়, কি কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, সকলই ঐ ত্রিপুটী ব্যতীত অন্য

কিছুই নহে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিচারকেই ত্রিশূলাঘাত অর্থাৎ ত্রিপুটী প্রয়োগ কহে। যে শক্তি প্রভাবে জ্ঞান সমুদ্র জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি রূপে তরঙ্গায়িত হয়, ঐ শক্তিই দেবী—মা আমার।

জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে

মন শক্তিরূপা মুক্তাফলে।”

রামপ্রসাদ

এই মায়ের দিকে লক্ষ্য রাখ। দেখিতে থাক, মা একদিকে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াকারে অসুররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন; আবার অন্য দিক দিয়া ত্রিশূলাঘাতে অর্থাৎ ত্রিপুটী প্রয়োগরূপ বিচারের সাহায্যে, উহাদিগকে নিহত করিতেছেন। সাধক? তুমি এইরূপ ত্রিপুটী বিচার করিতেছ বলিয়া উহাতে নিজ কর্তৃত্বের আরোপ করিও না। কারণ ঐ বিচার-শক্তিরূপেও মা'ই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিশূল রহস্য খুব ধীরভাবে বুঝিয়া কিছুদিন দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত বারংবার অনুশীলনের দ্বারা প্রকৃতিগত করিয়া লইতে পারিলে, সাধন সমরে জয়লাভ সুনিশ্চিত।

খড়্গ ও গদার আধ্যাত্মিক অর্থ—

ত্রিশূলের পর গদা। গদ্‌ধাতুর অর্থ ব্যক্ত বাক্য। ত্রিশূলাঘাতে—ত্রিপুটী প্রয়োগে যেরূপ অসুর নিধন হয়, গদাঘাতে—ব্যক্ত বাক্য প্রয়োগে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠেও, সেইরূপ অসুর বল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি রিপুচয় ক্ষীণ হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত খড়্গাঘাতেও অসুর নিধনের অর্থাৎ

মনোজয়ের উল্লেখ আছে। * খড়্গ দ্বিধাকারক অস্ত্র। জ্ঞানই মাতৃহস্তস্থিত খড়্গ। একমাত্র আত্মা—মা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই, এই সত্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, যাবতীয় অনাত্মভাব বিনষ্ট হয়। এইরূপ বিজ্ঞানখড়্গের আঘাতে সমস্ত বৈষয়িক প্রকাশ - অসুরভাব দূরীভূত হয়। সাধক! তুমি যদি অজপায় লক্ষ্য স্থির করিয়া থাক, যদি সত্য প্রতিষ্ঠা তোমার প্রকৃতিগত হইয়া থাকে, তবে বিষয়ের সম্মুখীন হইবামাত্রই তোমার জ্ঞান উহাকে সত্যরূপে—মা রূপে গ্রহণ করিবে, ইহাই অসুরগণের উপর জ্ঞান-খড়্গের আঘাত। এইরূপে শত শত অসুর নিহত হইয়া থাকে।

অসুরনাশের জন্য শর প্রয়োগ—

প্রণবাদি মন্ত্র অর্থাৎ মাতৃ আহ্বানই উপনিষদাদি শাস্ত্র—প্রতিপাদ্য শর। যখন অসুরবল সাধকের প্রশান্ত চিত্ততায় ব্যাঘাত ঘটাইতে থাকে তখন উহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ শর প্রয়োগ করিতে হয়। "মা, মা, মা, এই তুমি, এই তুমি, এত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি লইয়া, আমার বুকের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছ! মা, মা,—তুমি যে মা! কেন এরূপভাবে আমাকে উৎপীড়িত করিতেছ? মাগো তুমি স্থিরা প্রশান্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হও।" এমনই করিয়া পুনঃ পুনঃ শর নিক্ষেপ করিতে হয়, যেন তিলমাত্র সংস্কারের অবকাশ না থাকে। এত ঘন ঘন মন্ত্র জপ করিতে হয়, এত

---

* "কোচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ
খড়্গপাতৈস্তথাপরে।"

মধ্য ২।৫৭

বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে।

ঘন ঘন ব্রহ্মলক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিতে হয়, যেন একটুও ফাঁক না থাকে, এরূপ করিলেই সাধকের দেবভাবনাশক আসুরিক শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইরূপ করিলেই মনের জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন (গতিশক্তিহীন) হয়। সংস্কার সমূহের যে মুহুর্মুহুঃ চঞ্চলতা, তাহাই গতিশক্তি নামে অভিহিত। সংস্কার মাত্রেরই একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিই ভাবময়ী। 'অভিলাষ' বা 'গ্রহণ' উহার বাহু; প্রকাশ উহার অক্ষি এবং চরণ উহার গতি। উপরোক্ত জপে উহাদিগকে ধ্বংস হইতে হয়।

শান্তি লাভের উপায়।

যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁহার হৃদয়ে সদাই শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ বহু ভাগ্যবলে হইয়া থাকে।

প্রকৃত সন্ন্যাস—

গুরূপদেশে এই দেহরূপ বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি লাভ হইলেই বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হয়। আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হইলেই ইচ্ছার নাশ হয় এবং ইচ্ছার নাশেই যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া যায়। নতুবা একখানা গৈরিক বসন বা কৌপীণ ধারণ, কিংবা তিলক সেবন, কিংবা গলাতে তুলসীমালা ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, বৈষ্ণব বা পরমহংস হওয়া যায় না।

কর্ম্মযোগ ব্যতীত শাস্ত্রাদি পাঠে কিংবা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিলে বা কথায় মনঃস্থির কিংবা আত্ম-সংযম হয় না। যে কর্ম্ম জীব মাত্রেই অজপারূপে বিরাজ করিতেছে, সেই কর্ম্মই ব্রহ্ম। সেই অজপারূপ কর্ম্মকে ধরিলে তবে মনঃস্থির হইবে। আমি ইচ্ছা করি বা না করি আমার প্রাণকর্ম্ম বা অজপা যাহা আমি জন্মের সহিত পাইয়াছি তাহা বন্ধ

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং
সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।"
গী ১৮।২

হয় না। যাহা করা যায় তাহাই যখন কর্ম্ম তখন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ বা গ্রহণটাও আমার কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের উপর অর্থাৎ অজপার উপর সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিলে প্রাণ আপনা আপনি স্থির হইয়া থাকে। প্রাণ স্বতঃ স্থির হইলে, প্রাণকর্ম্ম বা অজপা রহিত হইয়া যাইবে, এবং প্রাণকর্ম্ম রহিত হইলে জ্ঞানোদয়ে ত্যাগও আপনা আপনি হইবে। তখন আর নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে না।

শাস্ত্রপাঠের আবশ্যকীয়তা ও নিস্প্রয়োজনীয়তা -

এরূপ অনেক দেখা যায় যে সাধু শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া না জানিয়া বা শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়াও কেবল আত্মকর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াছেন। শাস্ত্রপাঠে কেবল কতকগুলি কথা শিখা যায় মাত্র। উহাতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। জলপানেই পিপাসা দূর হয়। 'জল, জল' করিয়া চীৎকার করিলে পিপাসা মিটে না; তদ্রূপ শাস্ত্রাদি পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। (তাহারা 'বেদবাদরতাঃ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ। আর কোন তত্ত্ব নাই এই স্থির করায়) বরং বৃথা বাক্য ব্যয়ে শাস্ত্রের মীমাংসা না হইয়া ক্রমশঃ নাস্তিকতাই আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে সদাই শান্তি বিরাজ করে, কিন্তু আজকাল কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরই তাহা দেখা যায় না। বরং শান্তির পরিবর্ত্তে তাহার অভাবই দৃষ্ট হয়। শান্তি সাধনের ধন।

আত্মার সাধনহীন মন্দমতিগণ
বহু শাস্ত্র পড়িয়াও না পায় দর্শন।
গীতা ১৫।১১

যাহার যেমন ভাব তিনি তেমন ভাবে শাস্ত্র বুঝিয়া থাকেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বংশীধ্বংনি করিতেন, তখন যোশেদা মনে করিতেন "গোপালের ননী খাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া আমায় ডাকিতেছে।" সখাগণ মনে করিত "কানাই গোচারণের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" ধেনুবৎসগণ মনে করিত, আমাদের গোষ্ঠে বা মাঠে যাবার সময় হইয়াছে তাই রাখাল কানাই ডাকিতেছে" এবং সাধকগণ মনে করিতেন যেন প্রণবধ্বনি হইতেছে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এক বই দুই রকম নহে ; অথচ যাহার যেমন ভাব সে সেইরূপ বুঝিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কূটস্থ চৈতন্য, সকল ঘটেই বিরাজ করিতেছেন কিন্তু সকল ঘটেই প্রকাশ নহেন। যে সকল ঘটে প্রকাশ, তাঁহারাই ঋষি। তাঁহাদের আর নানা মত নাই। জীব জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নানা মত দেখিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্র পাঠ করা অপেক্ষা না করাই ভাল। কেননা শাস্ত্র পাঠে যদি আমার সংশয় দূর বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, তাহা হইলে আমার শাস্ত্র পাঠে আবশ্যক বা ফল কি? যখন শাস্ত্র অনন্ত, ও জীবের আয়ু অল্প, তখন শাস্ত্রের সারভাগ আশ্রয় করা উচিত। এস্থলে জল ত্যাগ করিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংস যেমন দুগ্ধ পান করে সেইরূপ অনন্ত শাস্ত্রের মধ্যে সার অংশটুকুই অবলম্বনীয়।

অজপাই শান্তি লাভের মুখ্য উপায়—

প্রাণকর্ম্ম বা অজপা সাধন ব্যতীত কখনই মুক্ত হওয়া যায় না। সহজ প্রাণায়াম রূপ অজপার অভ্যাস দ্বারা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপার শান্তিলাভ করা যায়। যথা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাজর্ষি জনক, শুকদেব, নারদাদি ঋষিগণ, তুলসীদাস, কবীর,

নানক, জীব গোস্বামী, চণ্ডীদাস এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধুগণ। সাধকবর রামপ্রসাদ সেন যে পদ্মবনের কথা তাঁহার গানের মধ্যে, বলিয়াছেন তাহা এই দেহের মধ্যেই আছে। অনেক সাধক এই দেহকেই বৃন্দাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ যে পদ্মবনের কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই পদ্মবন মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানে আছে এবং সেই বনে হংসও বিচরণ করিতেছে। সে হংস পক্ষী নয়, উহা আমাদের প্রাণ, যাহা শ্বাস রূপে প্রতি ঘটেই বিরাজ করিতেছে ; এবং যাহা জীব মাত্রেই প্রত্যহ ২১৬০০ বার অজপারূপে জপ করিতেছে।

কিন্তু যাদের ভোগ বাসনা অন্তরে আছে, তারা পার্থিব সুখভোগকেই মোক্ষ বলিয়া এই প্রাণায়ামরূপ মহাধর্ম্মের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন মাত্র।* এই অজপাকে লক্ষ্য করার নাম আত্মকর্ম্ম। একমাত্র আত্মকর্ম্মই শান্তি দিতে সমর্থ ; কর্ম্মই ব্রহ্ম এবং সেই কর্ম্মই আত্মকর্ম্ম। যিনি আত্মকর্ম্মের অভ্যাস করেন বা তাঁহাতে লাগিয়া থাকেন কিংবা লক্ষ্য করেন। তিনিই শান্তিলাভ করেন ; কারণ সেই কর্ম্ম শান্তিময়। জীব সেই কর্ম্মে রত হইলে শিবভাব প্রাপ্ত হয়। শিব ভাবই মঙ্গলময় ভাব এবং তাহাই শান্তি। কর্ম্মের দ্বারা জীব ভাবের নাশ হইয়া যখন শিবভাব প্রাপ্তি ঘটে, তখনই পরাশান্তি লাভ হয়। শান্তি দেওয়া যায় না, কর্ম্ম করিয়া ইহা লাভ করিতে হয়। পায়ের দ্বারা চলা যায়

---

* ইঁহাদেরই কথা গীতাতে নিম্নোক্ত ভাবে বলা হইয়াছে—

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

গীতা ৪।১২

বলিয়া উহাকে চরণ বলে। ইহা বাহিরের চরণ। এইরূপ আর একটী চরণ ভিতরে রহিয়াছে, তাহাই ভগবচ্চরণ, তাহা জীবমাত্রেই শ্বাসরূপে রহিয়াছে। শ্বাস দ্বারা জীবন প্রবাহ চলে বলিয়া তাহাকেও চরণ বলে। গুরুর উপদেশে এই চরণ জড়াইয়া ধরিতে হইবে। এই শ্রীচরণই আমার শান্তিময়ী মায়ের শ্রীচরণ যে গো।

এই সংসার যে দুঃখময় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংসারে কেন স্বর্গেও সুখ বা শান্তি নাই। মনে কর একটা পাখী সোণার দাঁড়ে হীরার শিকলে বাঁধা আছে ও আহারাদি রাজভোগ পাইতেছে। আর একটী লোহার দাঁড়ে ও লোহার শিকলে বাঁধা আছে ও অতি কষ্টে দিনান্তে দুইটা ধান ও একটু জল খাইতেছে। অবশ্যই তুমি বলিবে সোণার দাঁড়ে হীরার শিকলে রাজভোগ যে পাখী খাইতেছে সেই সুখী কিন্তু বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে কেহই সুখী নয়। কেন না উভয়ই বাঁধা আছে—কোনটাই মুক্ত নহে। তবে উভয় বন্ধনের তারতম্য এই—যেমন দেওয়ানী কারাগার (Civil jail) আর ফৌজদারী কারাগার (Criminal jail) জেলখানার ভোগরূপ দণ্ড শেষ হইলে, যেমন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থালী কর্ম্ম করিতে হয় তেমনি স্বর্গ ও নরক এই দুই ভোগের স্থান ; এবং ভোগের অবসানে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার কর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয়।

> তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
> এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥
> গীতা ৯। ২১

"তৎপরে নানাপ্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইয়া আসিলে তাঁহাদের পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যভূমিতে জন্ম হয়। এইরূপে স্বর্গকামনার বেদ প্রতিপাদ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে বারংবার গমনাগমন করিতে হয়।"

অতএব আপাততঃ রমণীয় মনমোহকর, কিন্তু পরিণামে বিষবৎ ও দুঃখকর, তাদৃশ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রকৃত শান্তি পথের পথিক হওয়া উচিত।

অজপা সহজ সাধ্য—

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ধর্ম্ম কখনও পৃথক্ হইতে পারে না। ধর্ম্ম একই, তবে উপস্থিত কালে সকল সম্প্রদায়ই যোগমার্গ পরিত্যাগ করায় ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিণত হইয়াছে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই স্থির করিতে পারে না ; এবং যে সম্প্রদায় মধ্যে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান নাই, সে সম্প্রদায় ব্যভিচারে পূর্ণ। কর্ম্মযোগের আশ্রয় ব্যতীত ব্যভিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। এই কর্ম্মযোগ অতি সহজ ও সুখসাধ্য। জীব সকল অবস্থাতেই ইহার অভ্যাস করিতে পারে। ইহার জন্য সংসারাশ্রিত স্ত্রী পুত্রাদি কিছুই ত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না। কোন উদ্যোগ বা আয়োজনের ও আবশ্যক নাই। 'করিব' মনে করিলেই করা যাইতে পারে। পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা অতি সহজ সাধ্য বলিয়া এবং ইহাতে কোন ভয়ঙ্কর ও কষ্ট কর ভাব না থাকায় ইহা তামসিক বা রাজসিক ভাবপন্ন জীবের প্রীতিকর হয় না। কাজেই তাহারা আপন আপন রুচির অনুযায়ী, সম্প্রদায় বিশেষের সৃষ্টি করিয়া থাকে ; এবং তাহারাই যোগ মার্গের নানা প্রকার অযথা গ্লানি করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া বেড়ায়। বস্তুতঃ জীব মাত্রেই ভগবদ্গীতোক্ত কর্ম্ম যোগের সাহায্য ব্যতীত পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় নাই। উহা প্রাপ্তির জন্য জীবকে গৈরিক পরিধান করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে

না ; উহা জীবমাত্রেরই দেহে স্বতঃ বিরাজ করিতেছে। উহার অভ্যাসে কোন প্রকার জাতি বিচার নাই, সকলেরই উহাতে অধিকার আছে। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন উক্ত কর্ম্ম ফল সমভাবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে সকলেই সমভাবে অধিকারী। যদি সে অধিকার সমভাবে সকলকার না থাকিত তাহা হইলে ভগবান্ অধিকারী ভেদে জীব দেহে পৃথক কর্ম্মের ভার দিতেন ; যখন মূলে কর্ম্মের পৃথক্ ভাব নাই তখন বুঝিতে হইবে যে, উক্তকর্ম্মে সকলকারই অধিকার তুল্য ভাবে রহিয়াছে ; তাহা বঞ্চিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। অতএব সকল বর্ণেরই উহা (অজপা লক্ষ্য) অবশ্য সাধ্য বলিয়া জানা উচিত, এবং সকলেই উহা সুখে অভ্যাস করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন।

প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান ব্যতীত কেহ সাত্ত্বিক কর্ত্তা হইতে পারে না। এক প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার অভাবে সাত্ত্বিক ভাব লুপ্ত হওয়ায় সংসার রজস্তমঃ প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রজস্তমো গুণের প্রাধান্যেই সংসারে এত অশান্তি। যাঁহারা তমঃ ও রজো গুণান্বিত, তাঁহারা পরিণামদর্শী নহেন। তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম করেন, তৎ সমুদয় পরিণামে ক্লেশকর ; কিন্তু আশু মুগ্ধকর বা সুখকর।

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেহ মৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥
গী ১৮। ৩৮

"বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ।"

যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্খা রহিত, সঙ্গরহিত, রাগদ্বেষ বর্জ্জিত ও পরিণামে সুখকর তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। একমাত্র প্রাণ কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা যায়। ইহার সঙ্গে যিনি থাকেন তিনিও তদ্‌ভাবাপন্ন হন, কেননা যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার গতিও তদ্রূপ। পরে তাহাতে থাকিতে থাকিতে তিনি তাহার অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন।

আশুসুখের লালসাতেই আমরা এত কষ্ট ভোগ করিতেছি। কাহারও অন্তরে সুখ নাই। কেবল লোক দেখান হাঁসি হাঁসিয়া লোকের কাছে সুখী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি মাত্র। অন্তরে সুখের লেসমাত্র নাই। সদা সর্ব্বদাই ঘোর অশান্তি বিষয়ের জ্বালায় ছটুফটু করিয়া বেড়াইতেছি। এ জ্বালা কিছুতেই যাইতেছে না এবং জ্বালা নিবারণের উপায়ও দেখিতেছি না। উপায় যে নাই এমন নহে। কিন্তু হায়! উপায় দেখিবে কে?

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
গী ১৮।৩৮

"ফল কামনা রহিত পুরুষ সঙ্গশূন্য ও রাগ দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।"

মুক্তির পথ

যোগমার্গ (প্রাণকর্ম্ম বা অজপা) ব্যতীত কিছুতেই পুরাণের গূঢ় রহস্য বা তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারা যায় না। যাঁহারা পুরাণাদি পাঠ করিয়া সাধারণকে শ্রবণ করান, তাঁহারা এরূপভাবে কথকতা করেন যে তাহাতে আরও অশান্তিই বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এককালে রাজা পরীক্ষিৎ, শুকদেবের নিকট এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে সেই পুরাণ সকলই শত শত স্থানে পঠিত হইতেছে, অথচ কাহারও শান্তিলাভ হইতেছে না। শান্তির পরিবর্ত্তে বরং অশান্তির বৃদ্ধিই দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ পরীক্ষিৎ পুরাণ শ্রবণে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু জীব সেই পুরাণই শ্রবণ করিয়া কেন শান্তি পাইতেছেন না? ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে উপস্থিতকালে যাঁহারা পুরাণাদি পাঠ করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পণ্ডিত ও বিষয়ী—যোগী নহেন। যোগী ব্যতীত কেহই পুরাণাদি শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সম্যক অবগত হইতে পারেন না।

বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী দাঁড়কা গ্রামে আমার দশ বৎসর বয়সের সময় পূজ্যপাদ ঠাকুরদাদা জীবন্মুক্ত ৺বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে একটী শান্তির সম্বন্ধে উপকথা বলিয়াছিলেন সেইটী নিম্নে যথাযথ বিবৃত করিলাম।

কোন এক সতী বিধবার একটী মাত্র পুত্র ছিল। স্বামীর কোন সম্পত্তি না থাকায় তিনি গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে দিয়া শিশুকে লালন

পালন করিয়াছিলেন। অর্থাভাবহেতু ইংরাজী শিক্ষালাভ বালকের ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু বালক বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিল। সুবুদ্ধি বালক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কুলীনের ছেলের বিবাহের অভাব থাকে না; বালক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৭ বৎসর বয়সে ইন্দুমতী নাম্নী ১১ বৎসর বয়স্কা কোন এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। বালকের নাম ছিল ব্রহ্মানন্দ। বিবাহ করিয়া ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে পারিল সংসারে অর্থ ব্যতীত শান্তিলাভ করা যায় না। অনন্তর অর্থোপার্জ্জণের জন্য ব্রহ্মানন্দ পাগল হইয়া চাকুরীর সন্ধানে ফিরিতে লাগিল; অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণের বহুবিধ তোষামোদ করিল। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন ও চাকুরী লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে এমন অবস্থা হইল যে পোষ্যবর্গের প্রত্যহ দুই বেলা অন্ন সংস্থান করা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহার মাতার কাল হইল। এইবার বালক যৎপরোনাস্তি বিপদগ্রস্ত হইল। আবার বিপদ একা আসে না। অতি অল্পদিনের মধ্যে ইন্দুমতী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে একটী কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিল। এমন সঙ্গতি নাই যে ধাত্রী আনা হয়। ধাত্রীকে ডাকা হইল বটে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ দরিদ্র বলিয়া সে প্রথমে আসিতে সম্মত হয় নাই। যাহা হউক, মাসান্তরে তাহাকে একটী টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ধাত্রী লইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। কল্য মাস পূর্ণ হইবে; প্রসূতি স্নান করিয়া উঠিবে। ধাত্রীকে একটী টাকা দিতে হইবে। বহুচেষ্টা করিয়াও কিন্তু ব্রহ্মানন্দ টাকা জোগাড় করিতে পারিল না। দুঃখে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সন্ন্যাসব্রত ধারণে কৃত সংকল্প হইয়া, ব্রহ্মানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া চলিল।

সন্ধ্যা তখন আগত প্রায়। পথশ্রমে ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ চলিয়াছে অদূরে এক মহাপুরুষ ধুনি জ্বালাইয়া মহানন্দে একতারা বাজাইয়া সীতারামভজন গাহিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একটু জল চাহিল। সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে তাঁহার এক ভক্ত তাহাকে জল ও ছোলা আনিয়া দিল। ব্রহ্মানন্দ জলপান করিয়া সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন "ঠাকুর, আমার সংসারের সকল সাধ মিটিয়াছে। আমাকে আপনার শিষ্য করিয়া লউন।" অন্তর্যামী সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন "বৎস, তোমার সাধ এখনও মিটে নাই। অর্থাভাব হেতু মনঃকষ্টে তুমি আজ আমার শিষ্যত্বগ্রহণ করিতে আসিয়াছ। যাও বৎস, এই ভস্মটুকু লইয়া তুমি নিজের বাটীতে যাও।" এই বলিয়া একটু ধুনির ভস্ম লইয়া তাহার বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন "বৎস, গ্রামে প্রবেশ করিয়াই শ্মশানের নিকট যে পুষ্করিণী আছে, তাহাতে স্নান করিবে। তাহা হইলে দেখিবে যে এই ভস্ম হীরকখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তদ্দ্বারা তুমি তোমার অর্থপিপাসা মিটাইও ও ধাত্রীকে তোমার প্রতিশ্রুত একটী টাকা দিয়া ঋণমুক্ত হইও।" ব্রহ্মানন্দ মহানন্দে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল এবং গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এই সন্ন্যাসী মহাপুরুষও গৃহী ছিলেন ; ব্রহ্মানন্দ তাহার জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল। মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হয় না। ব্রহ্মানন্দ সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়া প্রাতে গ্রামে প্রবেশ করিল এবং সন্ন্যাসী কথিত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া দেখিল যে ভস্মরাশি সত্যই হীরক হইয়াছে। মহানন্দে ব্রহ্মানন্দ এক স্বর্ণকারের নিকট একখানি হীরক বিক্রয় করিয়া দশ সহস্র মুদ্রা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। প্রথমেই ধাত্রীকে এক টাকার পরিবর্ত্তে দশ টাকা পুরস্কার দিল।

আজ ব্রহ্মানন্দের গৃহ তাহার আত্মীয় কুটুম্ব, পিতৃব্যপুত্রগণ, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিতে পূর্ণ। যাঁহারা একদিন ব্রহ্মানন্দকে দরিদ্র বলিয়া মুখ ফিরাইতেন, আজ হঠাৎ মহাপুরুষের কৃপাবলে সে রাজা হইয়াছে জানিয়া সকলেই তাহার গৃহে আসিয়াছে এবং তাহার প্রশংসা করিতেছে। হায় পয়সা! ক্রমশঃ অট্টালিকা হইল; দাসদাসী, দ্বারবান্ প্রভৃতিতে গৃহ পূর্ণ হইল। ব্রহ্মানন্দ জমিদার হইলেন। পরিশেষে রাজসরকার ব্রহ্মানন্দকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালের, দরিদ্র কুটীর বাসী, স্বজন পরিত্যক্ত, পোষ্য প্রতিপালনাক্ষম ব্রহ্মানন্দ আজ মহাপুরুষের কৃপাবলে ধনী, সুরম্য অট্টালিকা বাসী হইয়া 'মহারাজ' উপাধি লাভ করিয়াছেন। কালক্রমে ব্রহ্মানন্দের আর দুইটী পুত্র হইল। বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রাণ সম পুত্রকন্যা পরিবারাদি পরিবেষ্টিত হইয়াও কিন্তু ব্রহ্মানন্দের প্রাণে আনন্দ নাই, শান্তি নাই। সে জানিত অর্থেই শান্তি; কিন্তু আজ সে দেখিল অর্থেই অশান্তি। কোথায় যাইলে শান্তি পাইব—এই চিন্তাতেই ব্রহ্মানন্দ এখন কাতর। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন বৈকালে প্রমোদোদ্যানে জনৈক সাধুকে দেখিয়া তাঁহার চরণে সে পতিত হইল এবং শান্তি ভিক্ষা করিল। সাধু সদ্‌গুরুর নিকট হইতে 'অজপা' গ্রহণের উপদেশ দিয়া প্রস্থান করেন।

মহারাজ ব্রহ্মানন্দ শান্তি পাইবার জন্য সকল সভাসদ পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। কি উপায়ে শান্তি পাওয়া যায় তাহা জিজ্ঞাসা করাতে সভাস্থ পণ্ডিতগণ বলিলেন "মহারাজ, চারিলক্ষ টাকা খরচ করিয়া শত ব্রাহ্মণের দ্বারা এক বৎসর ব্যাপী হোম ক্রিয়া করিলে, ও নিত্য শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে এবং নিত্য দরিদ্র-

নারায়ণকে দান করিলে অবশ্য আপনি শান্তি পাইবেন।" মহারাজ ব্রহ্মানন্দ তাহাতেই সম্মত হইয়া অমাত্যগণকে চারিলক্ষ টাকা দিবার আদেশ করিলেন। হুলস্থূল ব্যাপার—এক বৎসরে হোম সমাপ্ত হইল; কিন্তু রাজা কিছুমাত্র শান্তি পাইলেন না; উপরন্তু চারিলক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ায় অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিলেন। রাজা পুনরায় সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। চারি লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও শান্তি না পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা রাজদণ্ডের ভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বলিলেন "মহারাজ, চারিলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যথারীতি হোমাদি শান্তি ক্রিয়া করা হইয়াছে; আপনি তথাপি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না; তখন বুঝিতে হইবে পূজ্যপাদ গুরুদেব ব্যতীত কেহই আপনাকে শান্তি দিতে পারিবে না। আবার শ্রীগুরুদেবই শান্তি দান করিবার একমাত্র অধিকারী। শিষ্যকে শান্তি দেওয়া গুরুদেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; নতুবা কেবল প্রতিমাসে তাঁহাকে দুই শত টাকা অর্থ সাহায্য এবং অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা রাখার কি প্রয়োজন? ইত্যাদি।".

পণ্ডিতগণ গুরুদেবকে দেখাইয়া ও তাঁহার বিরুদ্ধে বলিয়া রাজাকে বুঝাইলেন যে শ্রীগুরুদেবই শান্তি প্রদানের একমাত্র অধিকারী। সুতরাং তাঁহার শরণাপন্ন হইবার জন্য রাজাকে উপদেশ দিলেন। অনন্তর রাজা শ্রীগুরুদেবকে সসম্মানে আনাইলেন। শ্রীগুরুদেব রাজ সভাতে আসিয়া সব শুনিয়া বলিলেন "মহারাজ, পুরাণ শ্রবণ করিলেই শান্তি পাইবেন।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে দেখাইলেন।

রাজা গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পুরাণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ছয় মাস কাল ধরিয়া তিনি পুরাণ শুনিলেন। কিন্তু রাজার শান্তি লাভ তো হইলই না বরং অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইল।

বিপুল অর্থ তো নষ্ট হইলই উপরন্তু পুরাণ শ্রবণ করিতে করিতে রাজার অনেক স্থলে সংশয় ও অবিশ্বাস জন্মিল। তখন শান্তি প্রয়াসী মহারাজ অতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে মূঢ়ের মত তাঁহার গুরুদেবকে জানাইলেন "আমি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াও শান্তি পাইলাম না। আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে আপনি যদি আমার শান্তির উপায় না করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে সবংশে নিধন করিব, ইহাই আমার অদেশ।"

মহারাজের কথা শুনিয়া গুরুদেবের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি বাটী আসিয়া সকল কথা স্ত্রী কে বলিলেন। তাঁহার ভগবান্ নামে একটী পাগল ছেলে ছিল। সে সমস্ত শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "বাবা, তুমি ভয় পাইও না। রাজাকে আমি শান্তি দিব—আমি শস্তির উপায় বলিয়া দিব। আমি ইহা আমারগুরু দেবের নিকট হইতে শুনিয়াছি।" প্রথমে ব্রাহ্মণ পুত্রের এই সকল কথা পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পরে ব্রাহ্মণীর কথাতে বিশ্বাস করিয়া পাগল পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের নিকট আসিয়া বলিলেন "মহারাজ, আমার ভগবান নামে পুত্র আপনাকে শান্তির উপায় বলিয়া দিবার জন্য আজ আপনার নিকট আসিয়াছে।

মহারাজ গুরুদেবের পুত্রকে যথারীতি সন্মান করিয়া বসিতে আসন দিলেন এবং অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি প্রকারে শান্তি পাইবেন।

গুরুপুত্র ভগবান্ উত্তর করিলেন "মহারাজ আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আপনাকে আমি শান্তির উপায় বলিয়া দিব। কিন্তু আপনাকে গভীর রাত্রে একটী জঙ্গলের মধ্যে যাইতে হইবে এবং দুইগাছি বড়, নূতন ও শক্ত দড়ি চাই।"

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ ভৃত্যের দ্বারা দুইগাছি তথাকথিত দড়ি আনাইলেন। গভীর রাত্রে ভগবান্ রাজা ও পিতাকে লইয়া সন্নিকটস্থ এক নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, আমি কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনাকে এই বৃক্ষে বন্ধন করিতে পারি কি?" কিছুমাত্র ভীত না হইয়া রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা আপনি করিতে পারেন।" তখন গুরুপুত্র ভগবান্ রাজার চরণদ্বয় ব্যতীত অপর সকল স্থান রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। অনন্তর নিজ পিতার সম্মতি লইয়া তাঁহাকেও বন্ধন করিলেন। এইরূপে উভয়কে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া, পুত্র দশ বার হাত দূরে যাইয়া বলিলেন "মহারাজ, এইবার আমার সহিত শীঘ্র আসুন, আমি আপনার শান্তির উপায় বলিয়া দিতেছি।" রাজা উত্তর করিলেন "ঠাকুর, আপনি যে আমাকে বন্ধন করিয়াছেন; বন্ধ মুক্ত না করিলে কেমনে আপনার চরণ সমীপে যাইব?" রাজার উত্তর শুনিয়া গুরুপুত্র বলিলেন, "আমার পিতাকে আদেশ করুন, উনিই আপনাকে বন্ধনমুক্ত করিবেন।" রাজা বলিলেন, "গুরুদেবও যে আমার মত বদ্ধাবস্থায় রহিয়াছেন তিনি কি প্রকারে আমার বন্ধন মুক্ত করিবেন? আপনার বন্ধন নাই, আপনি মুক্ত অবস্থায় রহিয়াছেন; সুতরাং আপনি অথবা আপনার ন্যায় বন্ধন মুক্ত পুরুষই আমাদের এই বন্ধন মোচন করিতে পারেন। আপনার পিতার দ্বারা আমার বন্ধন মোচন অসম্ভব; কারণ তিনিও আমার ন্যায় বদ্ধ আছেন। একজন অন্ধ যেমন আর একজন অন্ধের পথ প্রদর্শক হইতে পারে না, সেইরূপ আমার এই রজ্জুবদ্ধ গুরুদেব আমার বন্ধনরজ্জু ছেদন করিতে পারেন না।

তিনি অগ্রে অপর কাহারও দ্বারা নিজের বন্ধন মোচন করুন, পরে আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। নচেৎ অসম্ভব।"

গুরুপুত্র রাজার এই উত্তর শুনিয়া বলিলেন "মহারাজ আপনি যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? রাজা উত্তর করিলেন "দেব ইহা যে ধ্রুব সত্য তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।" এতদুত্তরে গুরুপুত্র রাজাকে বলিলেন "মহারাজ, আপনি শান্তিলাভের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই উত্তম; কিন্তু মহারাজ, আপনার বিবেচনার কিছু ত্রুটি হইয়াছে। আপনি স্বমুখে এইমাত্র বলিয়াছেন যে নিজে বদ্ধ থাকিলে অপরকে বন্ধন মুক্ত করা যায় না। কিন্তু আপনি যে সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা হোমাদি শান্তিক্রিয়া করাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বদ্ধজীব। আপনি যেরূপ এই রজ্জুর দ্বারা বৃক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহারও সেইরূপ মায়ারূপ রজ্জুর দ্বারা সংসারবৃক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহই আপনাকে বন্ধন দশা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহেন, অথবা তাহার কৌশলও অবগত নহেন। অথচ তাঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া, আপনাদিগকে জ্ঞানী ও মুক্ত মনে করিয়া অপরকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পা'ন, কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া থাকে। এইজন্য এই সকল কর্ম্মের দ্বারা শান্তি না হইয়া অশান্তিরই বৃদ্ধি হয়। আপনি অবশ্যই এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে ব্রাহ্মণগণ আপনার শান্তির কোন প্রকার কর্ম্মই আপনার দ্বারা করাইতে বাকী রাখেন নাই। কিন্তু তাহাতেও আপনার শান্তি হয় নাই, উপরন্তু তাহারা আপনার অশান্তি বৃদ্ধির হেতু হইয়াছেন। যাঁহারা নিজেরা বন্ধন দশাগ্রস্ত, তাঁহারা কাজে কাজেই অপরের বন্ধন মোচনে অশক্ত। নিজের বা অপরের বন্ধন মোচন করিতে হইলে প্রাণায়ামরূপ যোগ কৌশল বা 'অজপা' জানা

উচিত। এই অপূর্ব্ব অজপাই সহজে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। ইহাকে শাস্ত্রে 'আত্মযোগ' বলিয়া থাকে। ইহার অপর একটী নাম আত্মকর্ম্ম। এই কর্ম্ম অভ্যাস করিলে আপনি শান্তি পাইবেন, কারণ কর্ম্মই ব্রহ্ম। এই 'আত্মকর্ম্ম' দ্বারা শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে শান্তি প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ, আপনি নিজেই ত এতদিন পূজা, জপ, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি অনেক কর্ম্মই করিয়াছেন ; কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম রাজসিক ও তামসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আপনার শান্তি লাভ হয় নাই। বরং অসহ্য অনুতাপ এবং শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিই লাভ করিয়াছিলেন।"

গুরুপুত্র এই বলিয়া রাজাকে 'অজপার' মহামন্ত্র "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" দান করিলেন ও অজপার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। রাজা অজপা পাইবা মাত্র ধন্য হইলেন এবং প্রাণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মহানন্দ রস পান করিতে লাগিলেন। প্রকৃত শান্তি পথ পাইয়া রাজা রাণীকেও 'অজপা' গ্রহণ করাইয়া সেই পথের পথিক করাইলেন এবং গুরুপুত্রকে মনুষ্যাকারে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাকে দক্ষিণা স্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন। গুরুপুত্র, রাজা শান্তি পাইয়াছেন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে সদ্‌গুরুকে প্রণাম করিলেন। রাজার প্রেমের দান গ্রহণ করিয়া দীন দরিদ্রনারায়ণগণকে পালন করিবার জন্য একটী অতিথিশালা প্রস্তত করাইয়া প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোকের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। গুরুদেব ও গুরুপত্নী পাগল সন্তানকে ছদ্মবেশী শুকদেব জানিয়া মহানন্দে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অর্থই বল, বিদ্যাই বল, উপাধিই বল, রূপই বল, কিছুতেই শান্তি নাই। মহারাজ ব্রহ্মানন্দ "অজপাতেই কিংবা

আত্মকর্ম্ম বা প্রাণ কর্ম্মেই প্রকৃত শান্তি আছে” ইহা রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন। অনেক প্রজাও অজপা গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। বহু জন্মান্তরের পুণ্যফলে রাজা রাজর্ষি জনকের ন্যায় রাজত্ব করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।

হে পাঠকগণ, যদি আপনারা শান্তি চান, তবে ঠাকুরদাদার উপকথাকে উপেক্ষা না করিয়া গুরু প্রমুখাৎ অজপার মহামন্ত্র ও প্রণালী জানিয়া লউন। ধন্য হউন, এই আমার নিবেদন।



"অজপাতে মুক্তি"

শাস্ত্রবাক্য ও প্রমাণ—

অজপা—(স্ত্রী) হংসমন্ত্র। যথা—

বিয়দর্দ্ধেন্দু-ললিতস্তদাদিসর্গসংযুতঃ।
অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ॥

অস্য দেবতার্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিঃ। যথা—

উদ্যদ্ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমূর্দ্ধাম্বিকেশং
পাশাভীতিং বরদপরশুং সংদধানং করাব্জৈঃ।
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু নশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং।
ইতি তন্ত্রসার॥

স্বাভাবিকনিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপেণ জীবজপ্যাহংসমন্ত্রঃ।
তথাচ দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্।
অথ বক্ষ্যে মহেশানি প্রত্যহং প্রজপেন্নরঃ।
মোহবন্ধং ন জানাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে॥
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপাতে যদা।
উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ॥

উচ্ছ্বাসৈরেব নিঃশ্বাসৈর্হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তস্মাৎ প্রাণস্য হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ॥
নাভেরুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাৎ হৃদয়াগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
ষষ্টিশ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্প্রাণা নাড়িকা মতাঃ॥
ষষ্টিনাড্যা হ্যাহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ।
একবিংশতিসাহস্রং ষট্শতাধিকমীশ্বরি॥
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্।
উৎপত্তির্জপমারম্ভো মৃত্যুস্তত্র নিবেদনম্॥
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী॥
অন্যত্রাপি। ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিম্।
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥
সন্ধ্যাবন্দনহীনা।

ইতি মহাভারতম্॥

অর্থাৎ—অজপা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাই হংস মন্ত্র। যথা—বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ বীজ 'হ'; অর্দ্ধেন্দু ঁ **চন্দ্রবিন্দু** (অথবা অনুস্বার); ললিত অর্থাৎ '**স**' তদাদি সর্গসংযুক্ত অর্থাৎ ঃ **বিসর্গ** সংযুক্ত (=হ ঁ স ঃ অথবা হংসঃ)। মনুকর্ত্তৃক উক্ত দ্বি অক্ষর এই হংস মন্ত্র কল্পতরু-সদৃশ ও "অজপা" নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই মন্ত্রের দেবতা 'অর্দ্ধনারীশ্বর' অর্থাৎ 'হরগৌরী' মূর্ত্তি। যথা তন্ত্রসারে :—উদীয়মান সূর্য্য এবং প্রস্ফুটিত বিদ্যুৎবর্ণ মস্তকাভ পাশ, বর, অভয় এবং পরশুধারী করপদ্মযুক্ত, নবমণিময়, দিব্যবেশ শোভিত, বিশ্বমূলা-

ধার, সৌম্য অথচ অগ্নিবর্ণ, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র সংযুত, হরগৌরীবপু আমাদিগকে রক্ষা করুন।

স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বরূপ জীবের জপ যে হংসমন্ত্র, তাহাই "অজপা"। প্রমাণ যথা দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় :—হে মহেশানি! অনন্তর তোমাকে সেই মন্ত্রের কথা বলিতেছি যাহা প্রত্যহ জপ করিয়া মানব মোহবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায় এবং মোক্ষাতীত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার আর মুক্তির আবশ্যক থাকে না। শ্রীগুরুর কৃপায় এতদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তাহা জপ করতঃ মানবের সংসার বন্ধন ক্ষয় হয়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ বায়ুর পূরণ ও রেচন দ্বারা হংস এই দুই অক্ষর জপ হয় বলিয়া আত্মাকারে সংস্থিত প্রাণের হংস এই নাম নাভি হইতে উচ্ছ্বাস এবং নিঃশ্বাস দ্বারা জীবের হৃদয়োপরি অধিষ্ঠিত আছে। ৬০ শ্বাসে 'প্রাণ', ৬ প্রাণে 'নাড়িকা' এবং ৬০ নাড়িকায় 'অহোরাত্র' এই ক্রমে জপ সংখ্যা নিয়মিত হয়। হে ঈশ্বরি! এইরূপে প্রাণীগণ প্রত্যহ ২১৬০০ (৬০ × ৬ × ৬০) বার সেই সান্দ্রানন্দময়ী পরমা অজপাকে জপ করে। এই জপের আরম্ভই জীবের জন্ম এবং ইহার সমাপনই মৃত্যু। হে দেবেশি! বিনা জপে আপনা আপনি জীবের এই জপ হয় বলিয়াই ইহাকে ভবপাশছেদনকারিণী "অজপা" বলা হইয়াছে। অন্যত্র প্রমাণ যথা মহাভারতে :—দিবা রাত্রিতে ২১,৬০০, এই মন্ত্র (অর্থাৎ "অজপা") জীব সর্ব্বদা জপ করে।

ষষ্ঠি, শ্বাসে অর্থাৎ ৬০ শ্বাসে প্রাণ, ছয়প্রাণে নাড়িকা হয়। এইরূপ ষষ্ঠি নাড়িকা বা ২১৬০০ বার অহোরাত্র জপ সংখ্যা। ৬০ শ্বাসে প্রাণ ছয়প্রাণে ৬০ × ৬ এক নাড়িকা ৩৬০ এইরূপ ৬০ নাড়িকা ৩৬০ × ৬০ = ২১৬০০ উচ্ছ্বাস (উর্দ্ধে উঠা) "হং" ও নিশ্বাস "সঃ" এই অক্ষরদ্বয় স্বভাবতঃ উচ্চারিত হইয়া থাকে সুতরাং প্রাণী জপ

দেখ্‌বি যদি চিকন্ কালা শ্বাসের-মালা জপ না
(আমার) মন্‌রে ভোলা কাঠের মালায়, জপ্‌লে জ্বালা যাবে না ॥
মালা ঘোরে অঙ্গুল ঘোরে ঘোরে সাধের রসনা।
(মন আমার) রঙ্গ পেয়ে, বেড়ায় ধেয়ে বশীভূত থাকে না ॥
করে করে সংখ্যা ক'রে, কর্‌তে গেলে সাধনা।
(মন আমার) কর ছেড়ে যায় কোথায় উড়ে, পায় না খুঁজে ঠিকানা ॥
(মন আমার) শ্বাসের সঙ্গে পরম রঙ্গে পদ্মবনে ভ্রম না।
(যখন) মধু খাবে নেশা হবে, ছট্‌ফানি থাকবে না ॥
একুশহাজার ছয়শতবার, জপ করে ত বুঝ্‌লে না।
(ও সে) জপের শেষে, নাভির শ্বাসে, প্রাণ যাবে তা জান না ॥
জীয়ন্তে মরবি যদি শ্বাসের সঙ্গ কর না
(অতি) যত্ন করি ধীরি ধীরি চক্র ধরি চল না ॥
(ও মন) ষঠ্‌চক্র ভেদি যখন যাবি আপন ঠিকানা।
(দেখ্‌বি) আলোর ভিতর কালো মাণিক ঘুচ্‌বে ভব যন্ত্রণা ॥
তার ভিতরে চন্দ্রবিন্দু, কি আশ্চর্য্য কারখানা।
(সে রূপ) দেখলে পরে এ সংসারে গতায়াত আর থাকবে না ॥

না করিলেও এই "হংস" মন্ত্র উক্ত সংখ্যানুসারে জপ হয়, এই নিমিত্ত "হংস" মন্ত্রকে "অজপা বলে। এই হংস মন্ত্রের বিপরীত "সোহহং"=সঃ+অহং অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, কিংবা পরমেশ্বরী দিব্য দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে। গুরু বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক রত্নাকর দস্যু প্রথমে "মরা, মরা" জপ করিয়া তদ্‌পরে রাম নাম জপিয়া বাল্মীকি মহামুনি হইয়া তারকব্রহ্ম রাম নামের মহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া ভুবনে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অজপা

অজপা :—যাহা জপিবার নহে অর্থাৎ অনায়াসে জপা যায়। জীব অহোরাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টাতে স্বভাবতঃ (আপনা আপনি) ২১,৬০০ বার অজপা জপ করে। এই জপ সংখ্যাই প্রাণীর দিবা রাত্রি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ামাত্র। এই জপ স্বতঃ অজ্ঞানবশতঃ সকল মনুষ্যেরই হইতেছে। গুরু কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় শক্তির দ্বারা জ্ঞানতঃ লক্ষ্য করিবার উপায় বলিয়া দিলে জীব মুক্তি লাভ করে।

"অজপা জপ"—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যে জপ বা মন্ত্র সর্ব্বদা হইতেছে তাহার উপর লক্ষ্য রাখার নাম "অজপা জপ"।

সাধারণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণবায়ুর ক্রিয়াই "হংস" বা "অজপা জপ"। সাধুগণ, ঋষিগণ ও মহাপুরুষগণ এই শ্বাস প্রশ্বাসকে "হংস" মন্ত্রে জপিয়া থাকেন।

ভক্ত বিশেষে গুরু বিচারপূর্ব্বক

রাধা	—	কৃষ্ণ
সীতা	—	রাম
হ্রীং	—	হ্রৌং
ওঁ	—	হ্রীং
ওঁ	—	গুরু
সৎ	—	গুরু
ওঁ	—	কালী
হং	—	সঃ
জয়	—	মা প্রভৃতি মন্ত্র

জ্ঞানতঃ লক্ষ্য করিবার জন্য ক্রিয়ার উপদেশ দেন।

বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য পুনরায় বলিতেছি যে "অজপা জপ" অর্থে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যে শব্দ সর্ব্বদা হইতেছে। আপনা আপনি প্রবাহিত নদীস্রোতে যেরূপ চাকা বসাইয়া কল চালান যায় সেইরূপ আপনা আপনি আমাদের অলক্ষ্যে যে শ্বাস প্রশ্বাসের জপ সদাসর্ব্বদা চলিতেছে তাহাতে জ্ঞান ও সংকল্প সংযোগ করিলে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

এই অজপাকেই সদ্‌গুরু "ব্রহ্মজ্ঞান" কিংবা "ব্রহ্মবিদ্যা" বলিয়া থাকেন। এই জগতে "অজপাই" মনঃস্থির করিবার একমাত্র সহজ উপায়।

"অজপা জপ" অভ্যাস করিলে গুরুকৃপা, কৃষ্ণপ্রেম লাভ, মুক্তি, শান্তি, পূর্ণানন্দ, দর্শন, অহরহঃ উপলব্ধি, প্রত্যক্ষ দর্শন, আত্মদর্শন এবং সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

"এই অজপা জপে" অসম্ভবও সম্ভব হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মধ্যে এই জপ আরম্ভ করিলে মনোস্কামনা পূর্ণ হয় ও সমস্তই করতলগত হয়।

অজপা গায়ত্রী—

মূলাধার পদ্ম ও স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অধোমুখে থাকাতে চিত্রা নাড়ী মধ্যস্থিতা ব্রহ্মনাড়ীর মুখও অধোভাগে আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এক মুখ ঐ ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। অন্য মুখে দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে। ইহাই জীবের শ্বাস প্রশ্বাস। শ্বাসবায়ুর নির্গমনকালে 'হং'কার ও গ্রহণ সময়ে 'সঃ'কার উচ্চারিত হয় যথা—

"হং কারেণ বহির্যাতি সঃ কারেণ বিশেৎপুনঃ
ষটশতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥
অজপা নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥
(ঘেরণ্ডসংহিতা ॥ ৮৩ ॥)

শ্বাসবায়ু নিষ্ক্রম ও প্রবেশকালে "হং" ও "সঃ" উচ্চারিত হয়, হংস ও সোঽহং এই শব্দদ্বয়ই এক। এই হংসই অজপা গায়ত্রী বলিয়া কথিত। জীব অহোরাত্র মধ্যে একবিংশতি সহস্র ষটশতবার এই গায়ত্রী জপ করে। 'হং' শিবস্বরূপ বা মৃত্যু—'সঃ" কারে গ্রহণ, ইহাই শক্তিস্বরূপ ; 'হং'—শিব বা পুরুষ, 'সঃ'—শক্তি বা প্রকৃতি। 'হংস'ই জীবাত্মা। এই দুইয়ের বিসংবাদে প্রাণরক্ষা হয়। অতএব এই শ্বাস প্রশ্বাসই জীবের জীবত্ব।

এই অজপা জপ মোক্ষদায়ী। ইহার সহিত গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র বা গুরু যে জপ দিবেন, তাহার সাধনা করিলে সাধকের মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অজপা জপের সংকল্প—

ষটসতাধিকৈকবিংশতিসহস্রাজপাজপেন
পরদেবতারূপ শ্রীপরমেশ্বরঃ প্রীয়তাং।

২১৬০০ শত অজপা জপ দ্বারা পরদেবতারূপী পরমেশ্বর প্রীত হউন।

অজপা গায়ত্রী সাধন—

অজপা গায়ত্রী জপ কোন অংশে ন্যূন নহে। যাঁহাদের সময় অল্প, তাঁহারা অজপা গায়ত্রী সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

"সোঽহম্ হংস-পদেনৈব জীবোজপতি সর্ব্বদা।"

'হংস' বিপরীত "সোহহং"

সর্ব্বদা জীব জপ করিতেছে। এই 'হংস' শব্দকেই অজপা গায়ত্রী বলে।

একবিংশতি সহস্রষট্‌শতাধিকমীশ্বরী।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্॥
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপয়েং ততঃ প্রোক্তা ভব পাশনিকৃন্তনী॥

যতবার শ্বাস প্রশ্বাস হয় ততবার "হংস" পরম মন্ত্র অজপা জপ হয় এবং প্রত্যেক মনুষ্যের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস **বহির্গত** ও প্রশ্বাস **অন্তঃপ্রবিষ্ট** হইয়া থাকে। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ। এই অজপা গায়ত্রী দ্বারা জীবের আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ হয়। "হংস"—"হং" ভিতর হইতে সতের অংশ টানিয়া লইয়া বাহিরের জগতে ঢালিয়া দিয়া প্রকৃতির পরিপুষ্ঠতা সংসাধিত করিয়া দিতেছে; আর "সঃ" বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভিতরে টানিয়া লইয়া সতের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতেছে। "হং" শিব বা পুরুষ—"সঃ" শক্তি বা প্রকৃতি। হংস শ্বাস প্রশ্বাসের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন, সুতরাং আত্মসম্পূর্ত্তি।

এই হংসই জীবের জীবাত্মা। মূলাধার হইতে হংস শব্দ উত্থিত হইয়া জীবাধার অনাহত কমলে ধ্বনিত হয়। বিনা আঘাতে ধ্বনি হয় বলিয়া এই পদ্মের অনাহত নাম হইয়াছে। বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া অনাহত হইতে "হংস" নাসিকা দিয়া প্রশ্বাস শ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে। অতএব জীব হইতে স্বতঃই হংস ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। এই হংস ধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হংস বিপরীত

"সোহহং" সাধকের সাধনা। অনাহত পদ্মে জীবাত্মা অহোরাত্র সাধনা বা যোগ অথবা ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। মানবের তমসাচ্ছন্ন বিষয় বিমূঢ় মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সদ্‌গুরুর কৃপায় ইহা জানিতে পারিলে আর মালা ঝোলা লইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না।

এই অজপা জপ মোক্ষদায়িনী। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কিংবা অর্দ্ধরাত্রে অজপা গায়ত্রী সাধন করিতে হয়। তাহার নিয়ম এইরূপ যথা—

সাধক আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুর ধ্যান করতঃ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে অনাহত পদ্মে বানলিঙ্গ শিবের মস্তকে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপ কলিকাকার হংস বীজ প্রতিপাদ্য তেজোময় জীবাত্মা মানস নেত্রে দর্শন করিয়া হংস ধ্যান করিবেন। ধ্যান যথা—গমাগমস্থং ইত্যাদি।

অনন্তর অজপা জপের অঙ্গন্যাসাদি করিতে হয়। পরে মনঃস্থির করিয়া, সুখাসনে স্থিরভাবে বসিয়া, গুরুর ধ্যান ও প্রণাম করিবে। তৎপরে গুরুর উপদেশ মত কুলকুণ্ডলিনী স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক অশ্বিনী মুদ্রা অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। কুণ্ডলিনী শক্তি না জাগিলে কৃপা উপলব্ধি হইবে না। সাধক দিবারাত্র, শয়নে, গমনে, ভোজনে এবং সংসারের কর্ম্ম করিতে করিতে, যখন ইচ্ছা অজপাতে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে পারে।

অজপাতে গুরুপূজা—

গুরুপূজা দুই ভাগে বিভক্ত যথা :—

(১) মানসিক ও (২) বাহ্যিক।

সকল লোকই মানসিক গুরুপূজার অধিকারী। কারণ মানসিক গুরু

পূজায় পরাপর ও পরমেষ্ঠী গুরুদ্বয়ের মাত্র পূজা করিতে হয়। ইহা মনুষ্যের দেহ ও মনকে নির্ম্মল ও ব্যাধিশূন্য করে। যাঁহারা মন্ত্র লইয়াছেন তাঁহারা বাহ্যিক গুরু পূজাও করিবেন। মন্ত্রদাতা গুরু না হওয়া পর্য্যন্ত বাহ্যিক গুরুপূজার আবশ্যক হয় না। মানসিক গুরুপূজা প্রত্যহ শেষরাত্রে বিছানায় বসিয়া করিতে হয়।

মানসিক গুরুপূজা—

বাহ্য মলাদি ত্যাগ করার পূর্ব্বে অন্তর্মলাদি ত্যাগ করা বিধেয়। অন্তর্দ্দেহ হইতে মল আসিয়া অন্ত্র মলের সহিত মিশিয়া দেহ হইতে নির্গত হয়। তাই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই শৌচাদি কর্ম্মের পূর্ব্বে (কিন্তু মল মূত্রাদির বেগ হইলে শৌচাদি সারিয়া আসিয়া বসিবেন) বিছানার উপর পদ্মাসনে বা যাহার যেরূপ আসন সুবিধা হয় সেই আসনে বসিয়া নাভির নীচে কোলের উপর বাম হাতের উপর দক্ষিণ হাত চিৎভাবে রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া গুরুর ধ্যান পড়িতে পড়িতে দেহের চেতন কর্ম্মের অধিপতি পরমেষ্ঠী গুরুকে সহস্রারে চিন্তা করিবেন।

পরমেষ্ঠী গুরুপূজা—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধাচারে সুখাসনে পূর্ব্ব কিংবা উত্তর-মুখে বসিয়া সূর্য্য নারায়ণকে ও গুরুদেবকে যুক্তকরে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ পাঠ করিবে।

প্রণাম—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জ্ঞানশক্তি সমারূঢ়ং তত্ত্বমালা বিভূষিতং।
ভুক্তি মুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্তব—

অনাচারাচার ভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্মুক্ত মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ॥

ধ্যান—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

পরাপর গুরুপূজা—

নাভির নীচে মেরুদণ্ড যে স্থানে শেষ হইয়াছে সেই স্থানে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্না নাড়ীর (Spinal cord) শেষভাগে মূলাধার চক্র (Cauda equina) অবস্থিত। সহস্রারে যেমন চেতন কর্ম্মের অধীশ্বর পরমেষ্ঠী গুরু অবস্থিত, তদ্রূপ মূলাধার চক্রে অচেতন কর্ম্মের অধীশ্বরী পরাপর গুরু কুণ্ডলিনী শক্তি (Filum Terminale) আছেন।

সেই মূলাধারে কোটী বিদ্যুৎ প্রভাযুক্ত নানাবর্ণে রঞ্জিত বসনে ভূষিতা, শৃঙ্গার রসে উল্লসিতা সর্ব্বদা কারণ (Cerelroo-spinal fluid দেহ উৎপাদনকারী রস) প্রিয়া, নিদ্রিতা সর্পের ন্যায় কুলকুণ্ডলিনী অধোমুখ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ মুর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া আছেন চিন্তা করিতে করিতে ধ্যান পাঠ করিবেন।

ধ্যান—

প্রসুপ্তভুজগাকারাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গমাশ্রিতাং।
বিদ্যুৎ কোটীপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াং॥

চৈতন্য বিধান—

দেহস্থ সমতড়িৎ (Positive electricity) শক্তির কর্ত্তা সহস্রারস্থ পরমেষ্ঠী গুরু (দেহস্থ পুরুষ শিব) এবং বিষম তড়িৎ (Negative electricity) শক্তির কর্ত্রী মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী। এই উভয় তড়িতের যোগে ব্রহ্মবর্ত্মে (Central canal of spinal cord) একটী অপূর্ব্ব আলোকের উদ্ভব হয়। সেই আলোক উদ্ভূত হইলে সহস্রারস্থ দৃষ্টিশক্তির ঋষি (Optic centre) দেহের সমস্ত পদার্থ ও কর্ম্ম দেখিতে পান। এই দর্শনে জীবের একটা অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্ভব হয়।* নিম্নলিখিত চৈতন্য বিধানের কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে সময়ে উক্ত যোগের উৎপত্তি হয়।

যং রং এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে শ্বাস যথাসাধ্য টানিয়া লইবেন এবং ঐ বায়ু মূলাধারে যাইয়া হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিল চিন্তা করিবেন। তদনন্তর "হংস" মন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্বাসকে ধারণ (কুম্ভক) করিয়া কুণ্ডলিনী ব্রহ্মবর্ত্মে সহস্রারে উঠিয়া রক্তবর্ণা ত্রিপুরা-সুন্দরীরূপ ধরিয়া সহস্রারস্থ শিবসঙ্গমে আমোদিতা হইলেন চিন্তা করিবেন। পুনঃ কুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মবর্ত্মে মূলাধারে আনিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবেন।

যাঁহারা নিরামিষভোজী ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী নহেন তাঁহারা শ্বাস রোধ না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিবেন মাত্র। উপরোক্ত ক্রিয়াটী ব্রহ্মচারী-গণের জন্যই প্রশস্ত—সংসার আশ্রমীর জন্য নহে।

ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবত্বাদি জীবন্মুক্তি প্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পুস্তক যেমন নিজে অচেতন (অজ্ঞান হইয়াও মনুষ্যকে জ্ঞান প্রদান করে, কুণ্ডলিনী শক্তি সেইরূপ নিজে অচেতন হইয়াও জীবকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রদান করে। তিনিই ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব এবং জীবন্মুক্তাবস্থা প্রদান করেন।

চৌদ্দ গণেশ ন্যাস—

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ায় যে তেজ উৎপন্ন হয় তাহার কিঞ্চিৎ অংশ বাহ্যদেশে আসিয়া সঞ্চিত হয়। যে যে স্থানে উক্ত তেজ সঞ্চিত হয় সেই সেই স্থানে তাহাকে সমরক্ষণ করিবার জন্য এই ন্যাসের প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত স্থানে লিখিত মন্ত্রগুলি দশবার জপ করিবেন।

হৃদয়ে	—	ক্রোং।
ডান চোখে	—	হ্রীং হ্রীং।
বাম চোখে	—	হ্রীং হ্রীং।
ডান কাণে	—	হ্রীং হ্রীং।
বাম কাণে	—	হ্রীং হ্রীং।
ডান নাকে	—	হূং হূং।
বাম নাকে	—	হূং হূং।
মুখে	—	স্ত্রীং স্ত্রীং।
নাভিতে	—	ক্লীং।
লিঙ্গমূলে	—	হে সৌঃ।
গুহ্যে	—	ব্লূং।
ভ্রূমধ্যে	—	হূঁ।

ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া নয়ন মুদ্রিত অবস্থায় চৌরগণেশ ন্যাসের পর পাঠ্য :—

অস্য অজপাগায়ত্রী মন্ত্রস্য হংসঋষিঃ অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমহংসোদেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ সোঽহং কীলকং পরমাত্ম প্রীতয়ে উচ্ছাসনিঃশ্বাসাভ্যাং ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতি-সহস্রজপাজপসমর্পণেনমোক্ষ প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ।

শিরসি হংসঋষয়ে নমঃ।
মুখে অব্যক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।
হৃদি পরমহংসদেবতায়ৈ নমঃ।
মূলাধারে হং বীজায় নমঃ।
পাদয়োঃ সঃ শক্তয়ে নমঃ।
সর্ব্বাঙ্গে সোঽহং কীলকায় নমঃ।

মনে মনে ঐ সকল স্থান স্পর্শ করিবেন।

হংসের ষড়ঙ্গ ন্যাসাদি—

হংসাং সূর্য্যাত্মনে তেজবত্যৈ শক্তয়ে হৃদয়ায় নমঃ।
হংসীং সোমাত্মনে প্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা।
হংসূং নিরঞ্জনাত্মনে অবিদ্যা শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট্।
হংসৈং নিরাভাসাত্মনে মায়া শক্তয়ে কবচায় হং।
হংসৌং অনন্তাত্মনে ঈক্ষণ শক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট।
হংসঃ অনন্তাত্মনে জ্ঞান শক্তয়ে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মনে মনে ঐ সকল স্থান স্পর্শ করিবেন। হংসের স্বরূপ অর্থাৎ "অর্দ্ধনারীশ্বর" মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে পড়িবেন—

হংকারঃ শিবরূপশ্চ সঃকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
হংসো হংসঃ ইতি মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥

যে হংসঃ মন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপিতেছে তাহার হংকার শিবরূপী এবং সঃকার শক্তি স্বরূপ।

হংসকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মনে মনে প্রণাম করিবেন।

গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিদ্রূপরূপং তিমিরান্তকারং।
পশ্যামি তং সর্ব্বজন প্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপং ॥

চলন্তি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে আমি গতিশীলে অবস্থিত হই কিন্তু নিজে গমন করি না। হংস নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ গাড়ীতে চড়িয়া গমাগমেতে থাকিয়াও গমনাদি শূন্য অবস্থায় আছে। হংস চিৎস্বরূপ এবং অজ্ঞান নাশক। তাই আমি পরমার্থরূপ হংসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রণাম করিতেছি।

অজপাজপ সমর্পণ—

মনুষ্য শ্বাস গ্রহণে বায়ু হইতে তেজ বীজ রং (Oxygen) সদাসর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া উহার দ্বারা রক্তকে পরিস্কার করে এবং নিঃশ্বাসে পৃথ্বী বীজ লং (Carbon) ত্যাগ করে। এই লং আসিয়া দেহের নানাস্থান হইতে রক্তের সহিত মিশিয়া ফুস্‌ফুসে আসিয়া নিঃশ্বাসের সহিত নির্গত হয় এবং ফুস্‌ফুস্ হইতে প্রশ্বাসের দ্বারা গৃহীত তেজবীজ রক্তের সহিত

মিশিয়া দেহের নানাস্থানে গমন করে। সুতরাং রক্তের দ্বারা দেহের অন্তঃশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। কাজের কমবেশীতে দেহের নানাস্থানে অন্তঃশ্বাস প্রশ্বাসের কমবেশী হইয়া থাকে। অজপা জপ সমর্পণে যেস্থানে যত শ্বাস প্রশ্বাস আবশ্যক সেইস্থানে তত শ্বাস প্রশ্বাস সমর্পণ করা হইতেছে।

ঋষিরা কর্ম্ম ও যন্ত্র অনুযায়ী দেহের ছয়টী ভাগ করিয়াছেন। এই ছয়টী ভাগের কর্ম্ম সমাধার জন্য সুষুম্নার ছয়টী ভাগ আছে। এই ভাগকে চক্র বা পদ্ম বলা হয়। আমাদের যাবতীয় অচেতন ও চেতন কর্ম্মের কেন্দ্রস্থান সুষুম্না এবং সহস্রার (Cerebro spinal system)। ইড়া ও পিঙ্গলা (left and right sympathetic cords) যাবতীয় স্নায়ু মণ্ডল ঐ সুষুম্না ও সহস্রার হইতে উঠিয়া দেহে বিস্তারলাভ করিয়াছে।

১। প্রথম স্থান মলাশয়, জননেন্দ্রিয় ও মূত্রাশয়। ইহাদের কর্ম্মকেন্দ্র মূলাধার (Cauda equina)। আমারা যে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করি তাহার ছয়শত শ্বাসের তেজবীজ দৈনিক ঐ স্থানে দরকার হয়। তাই অজপা জপ সমর্পণে আমরা মূলাধারে ছয়শত অজপাজপ সমর্পণ করি।

মূলাধারমণ্ডপে স্বর্ণবর্ণচতুর্দ্দলপদ্মে—দ্রুতসৌরবর্ণবর্ণবাদি-সান্তচতুর্ব্বর্ণান্বিতে গায়ত্রীসহিতায় রক্তবর্ণায় গণনাথায় ষট্‌শত সংখ্যকমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

মূলাধার পদ্মের সোণার বর্ণ চারিটী দলে গলিত সুবর্ণ বরণ ব শ ষ স চারিটী অক্ষর আছে। সেইস্থানে গায়ত্রীর সহিত রক্তবর্ণ গনেশ

(Master of phosphorescence) আছেন। আমি তাঁহাকে ছয়শত অজপা জপ সমর্পণ করি।

২। দ্বিতীয় স্থান—তলপেট ও পদদ্বয়। ইহাদের কেন্দ্র স্থান স্বাধিষ্ঠান (Enlargement of the spinal cord at the upper part of the lumber region)।

স্বাধিষ্ঠান মণ্ডপে বিদ্রুমনিভে বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভাভবাদিলান্ত-ষড়্‌বর্ণান্বিতে ষড়্‌দলপদ্মে সাবিত্রী সহিতায় ব্রহ্মণে অজপাজপং-ষট্‌সহস্রমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

স্বাধিষ্ঠান পদ্মের প্রবাল বর্ণ ছয়টী দলে বিদ্যুৎবর্ণ ব ভ ম য র ল ছয়টী অক্ষর আছে। তথায় সাবিত্রী সহিত ব্রহ্মা (Master of reproduction) আছেন। আমি তাঁহাকে ছয় হাজার অজপাজপ সমর্পণ করি।

৩। তৃতীয় স্থান—উপর পেট। ইহার কেন্দ্রস্থান মণিপুর (Enlargement at the lowest part of the dorsal portion)

মণিপুর মণ্ডপে সুনীলপ্রভে মহানীলপ্রভডাদিফান্ত—দশবর্ণ বিভূষিতে দশদলপদ্মে লক্ষ্মী সহিতায় বিষ্ণবে ষট্‌সহস্রম জপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

মণিপুর পদ্মের সুনীলবর্ণ দশটী দলে মহানীল বর্ণ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ দশটী অক্ষর আছে। তথায় লক্ষ্মী সহিত বিষ্ণু (Master of repair) বিরাজিত। আমি তাঁহাকে ছয় হাজার অজপা জপ সমর্পণ করি।

৪। চতুর্থ স্থান—বক্ষ ও হস্তদ্বয়, ইহাদের কেন্দ্রস্থান অনাহত পদ্ম (Enlargement at the end of the cervical portion)

অন্যান্য তন্ত্রে এই স্থানে আর একটি অষ্টদল কেন্দ্রের উল্লেখ আছে (Enlargement at the middle part of the cervical portion.)

অনাহতমণ্ডপে তরুণরবিনিভে মহাবহ্নিকর্ণিকাভকাদিঠান্ত-দ্বাদশবর্ণযুতে দ্বাদশদলপদ্মে গৌরীসহিতায় শিবায় ষট্‌সহস্রম-জপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

অনাহত পদ্মের নবসূর্য্যবর্ণ বারটী দলে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ আদি অগ্নিকণার ন্যায় বারটী অক্ষর আছে তথায় গৌরী সহিত শিব (Master of waste) অবস্থান করেন। আমি তাঁহাকে ছয় হাজার অজপা জপ সমর্পণ করি।

৫। পঞ্চম স্থান—পেটের ও বুকের যন্ত্রাদি, স্কন্ধ এবং মুখ। ইঁহাদের কেন্দ্র বিশুদ্ধাখ্য (Medulla oblongata.)

বিশুদ্ধ মণ্ডপে ধূম্রবর্ণে রক্তবর্ণ অকারাদি অঃকারান্ত ষোড়শস্বরান্বিতে ষোড়শদলপদ্মে প্রাণশক্তি সহিতায় জীবাত্মনে সহস্রসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে ধূম্রবর্ণ ষোলটী দলে রক্তবর্ণ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ষোলটী স্বর আছে। তথায় প্রাণশক্তির সহিত জীবাত্মা আছেন। তাঁহাকে আমি এক হাজার অজপাজপ সমর্পণ করি। (শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সহস্রার এবং সুষুম্নার অপরাংশ কাটিয়া ফেলিয়া কেবলমাত্র বিশুদ্ধাখ্য রাখিলে জীবের ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকিয়া জীবনী শক্তি

বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বিশুদ্ধাখ্যকে ফেলিয়া দিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া জীব তখনই মরিয়া যায়। তাই এইস্থানকে ঋষিরা জীবাত্মার আবাস স্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন)।

৬। ষষ্ঠ স্থান—মস্তক ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের কর্ম্ম কেন্দ্র দুইটী—আজ্ঞা চক্র (Cerebellum composed of two hemispheres) এবং সহস্রার (cerebrum or brain.)

আজ্ঞামণ্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জনিভে শুভ্রহক্ষবর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্মে মায়াসহিতপরমাত্মনে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

আজ্ঞাচক্রে বিদ্যুতের মতন দুই দলে সাদা হ ক্ষ অক্ষর আছে। তথায় মায়াশক্তির সহিত পরমাত্মা আছেন। আমি তাঁহাকে এক সহস্র অজপাজপ সমর্পণ করি। ইহা চেতন হইয়াও অজ্ঞান। ("It is itself insensible to irritation"—Longet) এই আজ্ঞাচক্রের উপরিভাগে মাথার খুলির অভ্যন্তরে সহস্রার অবস্থিত। সহস্রার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কেন্দ্র।

ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডপে কর্পূরাভে নানাবর্ণোজ্জ্বলদলবিভূষিতে নানাবর্ণবর্ণসমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রারে নাদবিন্দুপরিস্থিত ব্রহ্মরূপসশক্তিক গুরবে একসহস্রসংখ্যমজপাজপহং সমর্পয়ামি নমঃ।

কর্পূরবর্ণ সহস্রারের নানা রঙ্গের দল সমূহে নানা রঙ্গের অক্ষর সমুদয় আছে। তথায় নাদ ও বিন্দুর উপরিস্থিত ব্রহ্মস্বরূপ সশক্তিক গুরুকে এক হাজার অজপা জপ সমর্পণ করি। এই সহস্রারে দেহস্থ পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আজ্ঞাকারী এবং দেহের যাবতীয় কর্ম্মের নিয়ামক গুরু বাস করেন।

"আজ্ঞা সংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতং।"

তন্ত্রান্তরং।

নাদ অর্থ এখানে প্রাণবায়ুর ব্রহ্মরন্ধ্রে বহন কালীন শব্দ এবং বিন্দু—ভ্রূমধ্য।

"শ্রীশ্রী নাম তত্ত্ব"

বা

"নাম সংকীর্ত্তন"

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

মহাজন ও শাস্ত্র বলেন যে মনকে জয় করিতে হইলে কলিযুগে "শ্রীশ্রীনামই" প্রধান অস্ত্র। ভক্তিপূর্ব্বক ভক্তগণসহ নাম কীর্ত্তন করিলে সঞ্চিত কর্ম্মসকল খণ্ডন হয়। কর্ম্মফল খণ্ডন করা দুঃসাধ্য হইলেও একমাত্র তারকব্রহ্ম "নামই" যে কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারে ইহা মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব জগতে দেখাইয়াছেন। হে প্রভু! হে ইচ্ছাময়! ভক্ত বঞ্ছাকল্পতরু, সাধক হৃদয়নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ তোমার তত্ত্ব তুমি নিজে না বুঝাইলে কে বুঝিতে পারে? কৃপাময়! ইচ্ছাময়! প্রেমময়! তুমি নিজের ইচ্ছা করিয়া তোমার সেই সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হইলে কি আমাদের ন্যায় দীনহীন কাঙ্গাল পাপপরিক্লান্ত চির-নিরুদ্যম জীবনে তোমার তত্ত্ব বুঝা যায়? দয়াময়! তুমি নিজেই কৃপা করিয়া ও সদয় হইয়া যদি এ দগ্ধ হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হও তাহা হইলে তোমার "তত্ত্ব" এ জগতে বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। প্রভু! তাই সূচনায় তোমার স্মরণ করিতেছি, হে পাপীত্রাতা— দীনদয়াল ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু! দয়া করিয়া তোমার সেই দিব্য

মূর্ত্তিতে এ হৃদয় মরুভূমিতে আসন পরিগ্রহ কর—মরুক্ষেত্র শান্তিক্ষেত্রে পরিণত হউক। এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমারই দয়ায়, তোমারই ভাষায়, তোমারই "তত্ত্ব" জগতে প্রচারিত হউক ও বোধগম্য হউক নতুবা নামতত্ত্ব বুঝিবার বা বুঝাইবার বস্তু নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন যে প্রতি যুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর সেবা ও কলিতে নামসংকীর্ত্তন। এইরূপে যুগ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত বৃথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল "নাম" সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম জন্মিবে, তখন অনায়াসে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বরতত্ত্ব কি—তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, আপনা আপনি অনুভব করিতে হয়। যিনি গৌরপ্রেমে না মজিয়াছেন—তিনি কেমন করিয়া জানিবেন কেমন করিয়া বলিবেন এ কিসের ভাব! এ কোন আনন্দ সাগরের প্রবল ঘাত প্রতিঘাত! সাধক শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুর্য্য শ্রবণের ও কীর্ত্তনের অতি অদ্ভুত প্রভাব তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করিতেন, সেই অনুভূতিই জগতে ব্যক্ত করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।—

"শ্রীগৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়,   তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি ।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,   নিত্যলীলা তার স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী ॥"

মহাপ্রভুর প্রকটকালীন বাণী :—এসো দীন হীন পাপী তাপী যে যেখানে আছ, এসো এসো দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নাম দিবার জন্য ডাকিতেছেন। শুনিতেছ না, মধুরস্বরে নিতাই গাহিতেছেন—

"ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায় ॥"

পতিত শোন,—বৈষ্ণবগণ উচ্চনাদে বলিতেছেন,—

'যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়,
তাঁরা তারা দু' ভাই এসেছে রে।'

তবে আর ভয় কি? ভবসাগর ত গোষ্পদ! বিশ্বাস কর, বৈষ্ণবগণের বাক্য মিথ্যা নয়। তাই বলি ভাই "নাম কর"।

বৈদিক সাধন অতি কঠোর, এই নিমিত্ত তন্ত্র কলিতে বিধি দিয়াছেন,—

"জপাৎ সিদ্ধিঃ।"

কিন্তু কলির দুর্গম শাসনে ক্রমে দুর্ব্বলতর জীবের পক্ষে তাহাও কঠিন। মহাপ্রভু দেখিলেন, কলির জীব জপ করিতে অক্ষম। দয়ালু প্রভু এই নিমিত্ত অতি গুহ্যতর তত্ত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করিলেন,—"নাম"। নামই সর্ব্বস্ব, নামই ব্রহ্ম; নাম ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞান কর, ভব-

সাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হও। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধির বহুবিধ উপায় শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, কিন্তু কলির জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু। পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, জীবে দয়া রাখ, কোটী কোটী কঠোর তপস্যার ফলপ্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে; নাম ব্রহ্ম অভেদ বুঝিবে মানবজন্ম সার্থক হইবে। নাম ধর্ম্ম চারি যুগে বর্ত্তমান থাকিলেও প্রচার ছিল না। পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় হইতে ইহার বহুল প্রচার ও নাম ধর্ম্মের বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। নামাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই নূতন নাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

গৌরাঙ্গদেব ও গৌরধর্ম্মের বিষয় আমূল অবগত হইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক "চৈতন্যচরিতামৃত" ও "চৈতন্যভাগবত" পাঠ করেন, ইহাই বিনীত নিবেদন। গৌরধর্ম্মের তুল্য উদার মহান ধর্ম্ম আর নাই।

হায়! হায়! দীন হীন অধম আমি, আপনাদের উপদেশ দিবার ক্ষমতা আমার নাই তবে করযোড়ে অনুরোধ করি, যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ভগবানের ভাণ্ডারে নাই, যাহা অতুলনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সহজ ও মনোরম সেই 'নাম' আপনারা করুন। আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ নাম করুন। নাম করা অপেক্ষা প্রধান যজ্ঞ, মহা তপস্যা, প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, প্রধান পূজা, শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কিছুই নাই; সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হইয়া সর্ব্ব সময়ে সুধামাখা হরি নামটী করুন। নামের জন্য আসন, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, করন্যাস, অঙ্গন্যাস কিছুই আবশ্যক হয় না। গঙ্গাজলের জন্য কোন মন্ত্রশুদ্ধির আবশ্যক হয় না কেন না নিত্য শুদ্ধ; 'নাম' তাহা অপেক্ষাও

শুদ্ধতর। গঙ্গার এ শুদ্ধতা পবিত্রতা কেবল বিষ্ণুপাদ স্পর্শ নিমিত্ত, কিন্তু নাম গঙ্গা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র সে কথা ধ্রুবসত্য তাহার জন্য কোন বিচারের আবশ্যক নাই। অতএব সাধকগণ ভক্তগণ! সব ছেড়ে নামে মগ্ন থাকুন। নামই আপনাদের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিবেন কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক হইবে না। অন্ধকারের আলো, নাম; হৃদয়ান্ধকারের মধ্যে পবিত্র নির্দ্দিষ্ট পথ নাম আলোর সাহায্যে দেখিতে পাইবেন। তাই বলি নাম করুন, নাম করিবার জন্য কোন প্রকার পদ্ধতি বা নিয়ম নাই; শুচি অশুচির প্রয়োজন নাই—যে কোন প্রকারে নাম লউন আর যাঁহারা নামে মগ্ন তাঁহাদিগকে সঙ্গী করুন, পরম কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

"নামের মাহাত্ম্য"—

কলির মহামন্ত্র নাম বত্রিশ অক্ষর রে—
ভবতাপ নির্ব্বাপণ অমিয়া নিঝরে রে—
(ও ভাই নাম কর সার—নাম করবে পার—নাম বিনা আর গতি নাইরে)
(জপ জিহ্বা যন্ত্রেরে)
ও ভাই পঞ্চমুখে জপেন ত্রিপুরারীরে।
নারদ ঋষি দিবানিশি বিনা যন্ত্রে জপ করে
আমার নিতাই মালি মাথায় ডালি বিলায় নদিয়াই রে।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, নাম জপ অনিবার রে।
গোলকের প্রেমধন বিলাই নদীয়াই রে

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর রে
(আমার গোরা রাইরে—আমার নিতাই চাঁদরে)
বহায়িল প্রেমবন্যা দেশদেশান্তরে রে (কারেও বাকী
রাখলে নারে)
পাপী তাপী লয় নাম সানন্দ অন্তরে রে ॥
(হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥)
নাচে অন্ধ, গায় মূক, মাতি নাম রসে রে
পাষাণ গলিয়া যায় এই নাম শক্তি রসে রে ॥
যে আনিল হেন নাম, গাও জয় তাঁর রে
পতিত পাবণ গোরা, প্রেম অবতার রে ।
গোরা প্রেমে মাতোয়ারা অক্রোধ নিতাই রে
এস সবে প্রেম ভরে নিতাই গৌর গুণ গাই রে
জীবে বিলাও ওলো নাম চিন্তামনি-হার রে ॥

"নামতত্ত্ব" কি বুঝিবার বা বুঝাইবার বস্তু ? নামী স্বয়ং হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া "নামতত্ত্ব" বুঝিবার জন্য হৃদয়ের তন্ময়ত্ব—ভাব জন্মাইয়া না দিলে, আর কাহার সাধ্য যে "নামতত্ত্ব" বুঝিতে পারে বা বুঝাইতে পারে ? দয়াল ! প্রভু ! নামতত্ত্ব যে বাঙ্‌মনোবুদ্ধির অগোচর, চিন্তার বহির্ভূত, কল্পনার অতীত । যাহাকে তুমি জানাও সেই তাহা জানে, যাহাকে তুমি বুঝাও সেই তাহা বুঝে ; যাহাকে তুমি মজাইয়াছ সেই তাহাতে মজিয়াছে । নচেৎ তোমার "নামতত্ত্ব" কে বুঝিবে

প্রভু! এ অধম দুর্ভাগ্য পাপীর সাধ্য কি যে বুঝিবে বা বুঝাইবে। তুমি যে প্রভু পতিত পাবন! মুক্তির উপায় ও পতিতোদ্ধারের ভার চিরকালই তোমার উপর। একমাত্র ভরসা তুমি প্রভু! হে সর্ব্বনিয়ন্তা! হে জগদীশ্বর! তুমি অকুল কাণ্ডারী অনাথবন্ধু, "নামতত্ত্ব" হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় বিধান তুমিই কর দয়াময়!

কৃপাময়! আর কিছুই চাই না—কেবলমাত্র তোমারই শক্তি চাই, যে শক্তির বলে তোমার "নামতত্ত্ব" আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। দয়াল! আমার আর কোন অভিলাষ নাই; মাত্র এই অভিলাষ—যেন তোমার নামতত্ত্বে চিরদিন মতি থাকে।

নামাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই নামাশ্রয় করিয়া চলিলেই প্রেম আসিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—প্রেম আসিলেই প্রেমময় ভগবান দর্শন দিবেন। "নাম" ছাড়িলে চলিবে না সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব অবস্থায় নামটী স্মরণ থাকা চাই নতুবা কোন সন্ধান মিলিবে না। নাম সৎ, নাম চিৎ, নামই আনন্দ। নামের দ্বারাই সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাশ সর্ব্বত্র। পূজ্যপাদ, প্রেমিক ভক্তচূড়ামণি, সাধক শ্রেষ্ঠ, নামোন্মত্ত শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের উক্তি :—

"অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গোকটি কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম সংকীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেইজন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর ॥

ভক্তচরণাশ্রিত কাঙ্গাল অপূর্ব্বের একান্ত অনুরোধ আপনারা সর্ব্বাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া নামাশ্রয় গ্রহণ করুন। আপনাদের ভয়ই বা কি ভাবনাই বা কি! নাম করিলে ভব ভয় দূর হয়—ঐহিক ভয় কোন ছার? দয়াল! বাঞ্ছা কল্পতরু আপনাদের সমস্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন যেন নাম বিস্মরণ না হয়। নামকারীর ভয় অন্যায় এরূপ ভয় আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই—মাভৈঃ! আহা! আহা! নামাশ্রয়ে যে কি আনন্দ, কি শান্তি তাহা প্রকাশ করিবার বা বুঝাইবার যোগ্যতা আমার নাই। এসব জিনিষ বাক্য দ্বারা বুঝান বা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। বাক্য ভাষায় ইহার কিছুই প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র সাধনের দ্বারা ইহা প্রস্ফুটিত ও অনুভূত হয়। জন্মান্ধকে কি কখনও কোন দৃশ্য বস্তু ও কারুকার্য্য উদাহরণের দ্বারা বুঝান যায়? চিনির মিষ্টত্ব কি ভাষায় উপলব্ধি হয়? অসম্ভব। নামাশ্রয়ের আনন্দ ও শান্তি বুঝান তদ্রূপ। তবে আত্মনারায়ণগণ! 'নাম' করুন নামে মগ্ন হউন অচিরেই সমস্ত উপলব্ধি হইবে।

নাম সর্ব্বত্র, আকাশ ব্যাপিয়া নাম, হৃদয় ভরিয়া নাম, অন্তরে বাহিরে নাম, প্রতি জিনিষে নাম, প্রতি কর্ম্মে নাম, প্রতি ধর্ম্মে নাম, এই কথাই সর্ব্বশাস্ত্রে প্রকাশ। সাধু মহাজনদের নিকট এই কথাই শুনি— তথাপি আমাদের চৈতন্য কোথায়? আমরা মিথ্যা অসার পদার্থেই সর্ব্বদা মগ্ন—প্রকৃত সত্য, বিশুদ্ধ সর্ব্বদুঃখহর নামকে অন্তর হইতে অন্তর রাখিয়াছি। হায়রে মানব! ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে?

"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"—

ভক্তগণ! আপনারা মহাদস্যু রত্নাকরের নাম সকলেই জানেন— তিনি নামের গুণে দস্যু হইতে বাল্মীকিতে পরিণত হ'য়ে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

"কাজ কি জপে, কাজ কি তপে,
গুরুপদ ভাবনা
শ্রীগুরু স্মরণে কি ভয় মরণে,
গুরুদত্ত মন্ত্রে যাবে যম যাতনা॥
সহিত সাধনা সে ধনে সাধনা
মহাদস্যু রত্নাকর দেখরে তার তুলনা,
উল্টা রাম নামে বাল্মীকির পরিণামে,
মরা মরা বুলি ব'লে গেল পাপ লাঞ্ছনা॥"

আহা! তাই বলি নাম ভিন্ন কি জীবের তরিবার উপায় আছে!

নাম ব্রহ্ম, নাম সার, নাম ভিন্ন অন্য গতি নাই। কি সত্যযুগে, কি ত্রেতাযুগে, কি দ্বাপরযুগে, কি কলিযুগে চারি যুগেই নামের মহিমা ; নাম ব্যতীত ধরিবার উপায় নাই, নাম ব্যতীত তরিবার উপায় নাই, জগতে যাহা কিছু দেখুন সব নামময়। কোন কোন ঋষি বলেন, সত্যতে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে দান, আর কলিতে নাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস তা নয় ; নামের মহিমা চারি যুগেই আছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ হরিনাম ক'রে পিতৃবাক্য অবহেলা করেছিল, কিন্তু সেই প্রহ্লাদের হরিনাম কি পৃথিবীতে কেহ কখনও বিস্মরণ হবে না হয়েছে? পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ভক্তোত্তম ধ্রুবের নামগান কি কেহ ভুলেছে? ভগবান ভোলানাথ যোগাশ্রেষ্ঠ নামের জন্য, ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ নামের জন্য, নামাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব, সাধককুল-চূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন, প্রভৃতি বরণীয় ও পূজনীয় হয়েছেন কেবল নামের জন্য। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, সকলেই নামাশ্রয় করিতে চায়। যার পরিণাম জ্ঞান আছে, সেই জানে নাম ভিন্ন গতি নাই। নামের উপর নির্ভর ক'রেই সাধন ; নামের উপর নির্ভর ক'রেই ভজন। সাধন করিতে হইলেই গুরু যে নাম দিয়াছেন, সেই নাম অবলম্বন ক'রেই নাম গান ক'রতে হয়। জগতে যা কিছু দেখুন নাম ছাড়া কিছুই নাই। যিনি হরিনাম আশ্রয় করিতে পারেন তিনিই নরোত্তম, আর যিনি পারেন না তিনি নরাধম। কিন্তু আমরা করিলাম কি? আহা আপনারা দেখিয়া সাবধান হউন—এই নাম ভজনের সময়, এখন হইতে অগ্রসর হইতে থাকুন অচিরে ভগবানের কৃপা পেয়ে পরম কৃতার্থ হবেন। নাম-প্রেমে নিজেও মাতিবেন এবং জগতকেও

মাতাইবেন। এ সকলেরই মূল নামটীকে জানিয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ করুন।

তাই বলি সাধকগণ!

"নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
"যে নাম ভজিলে ভবে পাইবে নিস্তার॥

শ্রীহরি নামই কলির ভজন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব যতদিন রসণার উচ্চারণ ক্ষমতা আছে, প্রাণ ভরিয়া নাম কীর্ত্তন কর, অশক্ত হইলে মহানন্দে শ্রবণ কর। তাহাও যদি না পার শ্রীহরি নাম মানসে স্মরণ কর, তোমার সকল নিরানন্দ চিরানন্দে পর্য্যবসিত হইবে। নতুবা পাপতপ্ত দগ্ধ প্রাণ জুড়াইবার আর অন্য উপায় নাই।

নামের এমনই মহীয়সী শক্তি, একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে পাপীর হৃদয়ে পটাঙ্কিত সকল পাপের রেখা অনায়াসে মুছিয়া যায়। তাই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন :—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে
"পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে॥"

অতএব সাধকগণ, ভক্তগণ, আত্মনারায়ণগণ! সংসারে কুটিনাটি 'কর্ম্মনাশার' জলে বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দময় হৃদয়দেবতা শ্যাম সুন্দরের সুকোমল শ্যাম মূর্ত্তিখানি চিরদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত এবং হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অকপট হৃদয়ে অন্তরের কথা অন্তরে অন্তরে অজপাতে (শ্বাস প্রশ্বাসে) ব্যাকুল হইয়া নিবেদন কর। আর বাহিরে তাঁহার শ্রীনাম-গাথাবলী স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে থাক, জগতের মধ্যে

তোমার কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। যে হেতু শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ভিন্ন কলির জীবের আর কোন শ্রেয়ঃ ও কৃত্য নাই—করিবার আবশ্যকতাও নাই যথা ঃ—

নাম সম নহে জ্ঞান, নাম সম নহে ধ্যান,
নাম সম নহে ব্রতফল।
ত্যাগ নহে নাম সম, নাম তুল্য নহে শম,
নাম তুল্য নহে পুণ্যবল ॥
নাম তুল্য নহে গতি, নামই পরমা গতি,
নামেই পরমা শান্তি হয় ॥
নামই পরমা স্থিতি, নামই পরমা স্মৃতি,
কৃষ্ণ নাম পীরিতি পরম।
সকল কারণ নাম, জীবের-পরম ধাম,
এই সর্ব্ব শাস্ত্রের মরম ॥
নামই পরমারাধ্য, নামই জীবের সাধ্য
জীবের পরম প্রভু গুরু।
সর্ব্বফল সমাহরি, কৃষ্ণনাম সর্ব্বোপরি
কলি যুগে সাক্ষাৎ কল্পতরু ॥

অতএব, হে সংসার-ভীত জীব! যদি আদি ব্যাধি পাপ তাপের জালা জুড়াইয়া হৃদয়কে আনন্দামৃত-ধারায় অভিষিক্ত ও পবিত্র করিতে চাও তবে কলিকালের ধর্ম্ম স্বরূপ একমাত্র শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন কর একবার এই নাম-সুধারস আস্বাদন কর, দেখ, কেমন প্রাণারাম ও শান্তিপ্রদ।

মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ কি? প্রেমলাভ করা। শ্রীহরিনাম সেই প্রেমলাভের উপায় স্বরূপ। পাপ সংক্ষয় ও মুক্তি শ্রীনাম কীর্ত্তনের মুখ্য ফল নহে। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করাই মুখ্য ফল। মুক্তি ও পাপের বিনাশ নামের আভাস মাত্রেই সংসিদ্ধ হয়। যথা—

"হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয়।
"নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
"তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥

চরিতামৃত ৩।৩

হে ভক্তনারায়ণগণ! আপনাদিগকে যুক্তকরে নিবেদন করিতেছি যে কর্ম্মফল খণ্ডনের একমাত্র উপায় "অহরহঃ নাম লওয়া"। যদি অজপাতে নাম লইতে না পারেন তবে ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাম লইলে অবশ্যই সর্ব্বপাপ ধ্বংস ও মুক্তিলাভ হইবে অতএব আইস ভক্তগণ, আইস সাধকগণ! সকলে মিলিয়া "হরি হরি" বলিয়া আজ হইতে আমরা নামের শরণাগত হইয়া নামের আশ্রয় লইয়া জীবন সার্থক করি।

ওঁ তৎসৎ গুরু ওঁ।

প্রার্থনা

হে মঙ্গলময়! প্রেমময়! হে পূর্ণ! মঙ্গল বিধান কর! বিঘ্ন বিনাশন! বিঘ্ন দূর কর! শক্তিময়! শক্তি সামর্থ দাও! স্মৃতি-ধৃতি জ্ঞান, বুদ্ধি, সর্ব্বমূলাধার তুমি বিভ্রম বিদূরণ কর।

কেন ভুলে যাই? কেন বিশ্বাসহারা হই? কেন নির্ভরতায় সংশয় আসে? রে দুষ্টবুদ্ধি, রে কুপ্রবৃত্তি! তুই সম্মুখ হ'তে দূর হ'। এমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ এমন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, এমন বিশ্বপ্রভ সূর্য্য সংশয়ের কুয়াশায় অবিশ্বাসের মেঘে কেন ঢাকিয়া ফেলিস্? তুই না এমন করিলে, ধর্ম্মবিশ্বাসহীন নির্ভরতা হারা না হইলে মানুষ ত্রিতাপে অস্থির হইবে কেন?

প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—বিশ্বাস কর আর নাই কর—নির্ভরতার কি মহিমা! বিপত্তির বিশাল পারাবারে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে—কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর কণ্ঠে ডাকিয়াছি—"দীননাথ রক্ষা কর"। অমনি তিনি পিতার দয়ায়, মাতার মমতায় সান্ত্বনার স্নেহ সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, প্রাণ পুলকে প্রফুল্ল হইয়াছে। রে দুষ্টবুদ্ধি। তুই আবার কেন এলি? আবার কেন বিস্মৃতির ব্যবধান করিলি? আবার কেন তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম? আবার কেন নরকে ডুবিলাম।

হায়! আমাদের "শান্তিপথ" বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমাদের উন্নতির সোপান ভগ্ন ইষ্টক স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যেদিন হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতে ঈশ্বরে

নির্ভরতা হারাইয়াছি, সেইদিন হইতেই পথ পিছাইয়া পড়িয়াছে—সোপান ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিবা ঐশ্চর্য্যম্পদ, কিবা সুখশান্তি, আমাদের এখন আর আপনার বলিবার কিছুই নাই। তবে হয়,—আবার হয়; আবার যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস, ঈশ্বরে নির্ভরতা হয়, আবার যদি ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করি, অজপাতে লক্ষ্য করি, আবার যদি আমরা পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইতে পারি! ডাকিতে জানিলে নিশ্চয় তিনি শুনিতে পান। কাঁদিয়া ডাকিলে নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যক্ষীভূত হ'ন। এস আত্মনারায়ণগণ, আমরা বিশ্বাস পূর্ব্বক 'অজপাই যে শান্তিপথ' তাহা ধরিয়া শান্তিলাভ করি। সন্দেহ ও আলস্য যেন আমাদিগকে এই প্রেমের পথ হইতে বিপথগামী না করে। এ পথ ত্যাগ করিলে আবার জন্মজন্মান্তর ঘুরিতে হইবে। তাই সদ্‌গুরু ডাকিতেছেন। এ আহ্বান আমার নয়—সদ্‌গুরুর; বিশ্বাস কর। ক্ষুদ্র আমি ডাকিবার সাধ্য আমার হইতে পারে না। ঐ শুন, তিনি ডাকিতেছেন, বিশ্বচরাচরে, নিজ দেহাভ্যন্তরে; একটু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। "ওম্ ওম্" রবে তিনি ডাকিতেছেন। তিনি দয়ার ঠাকুর তাই অহরহঃ দয়া ও প্রেম বিতরণ করিতেছেন হেলাতে হারাইও না। এস আত্মনারায়ণগণ এস, এস সংসারের প্রপীড়িত জীব, আজ আমরা চিরকল্পতরু শ্রীসদ্‌গুরুর চরণতলে শরণাগত হই। তাঁর শ্রীপাদ মূলে সংসারের শোক দুঃখ জরা ব্যাধি নিবেদন ক'রে "শান্তিপূর্ণ আনন্দ নির্ঝরের" খোঁজ লইবে এস। সেই ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান স্বরূপ চিদানন্দময়ের শ্রীচরণতলে ভক্তি সহকারে শতশত বার প্রণাম করি।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতম,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

যিনি স্থায়ী আনন্দভাবে সর্ব্বদা না থাকিতে পারা পর্য্যন্ত কিছুতেই আনন্দিত হইতে চাহেন না তিনিই জীব। যিনি সর্ব্বদা গম্ভীর—যাঁহাকে পরমাত্মার সহিত মিলন ভিন্ন কিছুতেই সুখ দেওয়া যায় না তিনিই জীব। যিনি অনুতাপ করেন, তিনি জীব নহেন তিনি মন। যিনি বিষয় লইয়া আনন্দ করেন, কর্ম্ম করিয়া আনন্দ করেন, যিনি এক দিন একটু ভগবান্‌কে ডাকিয়া আনন্দ করেন, আবার পরদিন ডাকিতে না পারিলে দুঃখিত হয়েন, তিনি জীব নহেন মন। যিনি দুঃখে অধীর হয়েন, তিনি জীব নহেন। জীবের নিকট যে মন থাকে তাহাই জীব-সান্নিধ্যে থাকিয়া শক্তি লাভ করিয়া বহু রঙ্গ তুলিতেছে, সুখী দুঃখী হইতেছে, সাধন ভজন করিয়া আস্ফালন করিতেছে। জীব কিন্তু যিনি তিনি আপন অখণ্ড স্বরূপ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সুখী হন না, সংসারের আর কিছুতেই যথার্থ দুঃখীও হন না। হীন অবস্থায় আসিয়া বড়লোকে যেমন সমস্ত দেখে, সব সয়, জীবও তাই। অনেক সময়ে ইঁহাকে ধরাও যায় না কোথায় আছেন।

সদ্‌গুরু আনন্দ-ব্রহ্ম। আমি জীব, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি। তুমি পরম সুখ-স্বরূপ, জীবকে প্রকৃত আনন্দ দানে তুমিই সমর্থ। তুমি কেবল আনন্দ। কেবল আনন্দ ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই নাই। জ্ঞান-মূর্ত্তি তুমি,—সুষুপ্তির অজ্ঞানানন্দ তুমি নও তুমি সজ্ঞানানন্দ। শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব তোমাতে নাই। তুমি গগনসদৃশ সীমাশূন্য। শ্রুতি, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। তুমি এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। 'এক' বলিয়া তুমি স্বগত-ভেদ শূন্য, 'এক' বলিয়া

তুমি স্বজাতীয় ভেদ হীন, এবং 'অদ্বিতীয়' বলিয়া তুমি বিজাতীয়-ভেদ বর্জ্জিত। নিত্য বস্তু তুমিই,—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে একমাত্র তুমিই আছ,—যাহা সর্ব্বকালে থাকে না তাহা অনিত্য। তুমি নিতান্ত নির্ম্মল—অজ্ঞান-মল তোমাতে নাই। তুমি সর্ব্বদা অন্তরের ও বাহিরের সকল চেষ্টার, সকল কার্য্যের দ্রষ্টা—সর্ব্ব বিষয়ের সাক্ষী তুমি! তুমি ভাবাতীত ও গুণাতীত।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

যিনি আপন মহিমায় মায়ার কুহক নিরস্ত করিয়া আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিত সেই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি।

সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান অজপার মধ্যেই নিহিত। অজপাই ব্রহ্মবিদ্যা এবং একমাত্র তাহার কৃপাতেই ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। সর্ব্বশেষে হে আত্মনারায়ণগণ, আমার কাতর প্রার্থনা যেন 'অজপাই যে কল্পতরু' তাহাতে আপনাদের স্থির বিশ্বাস থাকে। অবিশ্বাস যেন এই মুক্তির পথ—শান্তির পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট না করে। অবহেলা ও আলস্য যেন সাধনের পথে অন্তরায় না হয়। এই বিদ্যা অভ্যাস যেন সদাই আপনাদের কল্যাণবিধান করে। এই কল্যাণবিধায়ক সত্যপ্রতিষ্ঠা অজপারূপ ব্রহ্মবিদ্যা জয়যুক্ত হউক।

পুনরায় সেই আদিপুরুষ সর্ব্ব কারণের কারণ গোবিন্দ, যিনি গুরুরূপে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে আমাদের সম্মুখে জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

স্ফুরন্তি সীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

যে ব্রহ্ম হইতে আনন্দকণা আকাশে ও ভূমিতলে স্ফুরিত হইতেছে, সর্ব্ব জীবের জীবন, সে আনন্দ-ব্রহ্মকে নমস্কার। (গীতা পরিচয়)

'নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমোঽস্তে।

(গুরু তুমি) আপনারই করে আমার এই ঘরে
গৃহদীপ খানি জ্বালো।
(আমার) সব সুখ দুঃখ সার্থক হোক লভিয়া তোমারই আলো॥
(আমার) কোনে কোনে যত লুকান আঁধার মরুক ধন্য হোয়ে
(গুরু) তোমারই পুণ্য কিরণে জাগিয়া প্রিয়জনে বাসি ভাল॥
(গুরু) পরেশ মণির প্রদীপ তুমি অচপলতার জ্যোতি,
(গুরু) সোনা ক'রে দাও পলকে আমার সব কলঙ্ক কালো॥
আমি যত দীপ জ্বালি তার শুধু জ্বালা আর শুধু কালি
(গুরু) আমারই ঘরের শিয়র দুয়ারে তোমারই কিরণ ঢালো॥

মা'র অভয় বাণী ।

হে আনন্দময় অমৃতের বরপুত্র স্নেহের দুলাল বৎসগণ! কে কোথায়-আর্ত্ত দীন দুঃস্বপ্ন-পীড়িত-অজ্ঞানের মিথ্যার-গভীর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ! পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে, রোগ শোক অনুতাপের উৎপীড়নে, চঞ্চলতার ঘোর আবর্ত্তনে মথিত দলিত হইয়া, হতাশের উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ? এস, ছুটিয়া এস পুত্র! এই দেখ তোমাদের জন্য আমার বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি—অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া, তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি। তোমরা মা বলিয়া ডাকিবে—তোমাদের সুধাময় মাতৃ-আহ্বান শ্রবণ করিয়া আমি আত্মহারা হইব, তোমাদিগকে আত্মহারা করিব। তোমাদের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিব, তোমরা অমর হইবে তাই মুক্ত কণ্ঠে আহ্বান করিতেছি—এস বৎস! এস পুত্র! একবার নয়ন উন্মীলন কর। আর কতকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাঙ্গাল সাজিয়া থাকিবে। দেখ-মুহূর্ত্তের জন্য আমি তোমাদিগকে অঙ্কচ্যুত করি নাই তোমরা আমরাই গর্ভে জাত, আমারই অঙ্কে ধৃত, আমরাই স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছ দুঃখ আর ত্রিতাপ বলিয়া কিছু নাই, জন্ম বা মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, নৈরাশ্য বা উৎপীড়ন বলিয়া কিছু নাই, যাহা দেখিয়া তোমরা ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইতেছ, উহা আমারই স্নেহস্তন্য।

অই শুন! অজপার বিজয় ঝঙ্কার উঠিয়াছে মধুময় মাতৃ আহ্বানে

ব্যোম মণ্ডল মুখরিত হইতেছে—বসুন্ধরা প্রাণময় সত্য আহ্বানে জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, সলিল রাশি সত্য নিনাদে উদ্বেলিত হইতেছে—বায়ু সত্য ধ্বনি অভিঘাতে তরঙ্গায়িত হইতেছে অন্তরীক্ষ সত্যের পুত প্রণবনাদে পরিপুরিত হইতেছে; এখনও তুমি সুপ্ত থাকিবে? এখনও মিথ্যার কালিমা মুখে মাখিয়া দীনতার দুঃস্বপ্নে উৎপীড়িত হইবে? আর না বৎস! একবার এস—একবার ফিরিয়া দাঁড়াও, একবার মুখটা ফিরাও, আমি তোমাদের চাহিয়া কত যুগ যুগন্তার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। এস মাতৃহারা শিশু! অমৃতের সঞ্জাবনী ধারায় অভিষিক্ত হও। শান্তির-আনন্দের বিমল সলিলে অবগাহন কর: মায়ের কোলে নিত্য অবস্থান বা ব্রাহ্মীস্থিতি উপলব্ধি করিয়া অমর হও।

তাই বারংবার ডাকিতেছি,—এস অমৃতের পুত্রগণ! যদি জাগিয়াছ, যদি জগৎকে সত্যেরই মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিয়াছ, যদি জড়কে চিন্ময়রূপে আদর করিতে শিখিয়াছ, যদি সর্ব্বভূতে ভগবৎ সত্তা দর্শন করিতে অভ্যস্থ হইয়াছ, তবে এস, উঠিয়া দাঁড়াও! আমার দিকে তাকাও, দেখ অগণিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল সর্ব্বদাই আমারই আরতি করিতেছে। অগণিত বিশ্ব আমরই অঙ্গে যুগ যুগান্তর ধরিয়া শোভা পাইতেছে। অগণিত জীব কোন অনাদি কাল হইতে আমারই পূজার অর্ঘ্য সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া ছুটিতেছে। দেখ—এ ব্রহ্মাণ্ড—যজ্ঞাগারে প্রতি পরমানু আমারই উদ্দেশ্যে প্রাণাহুতি অর্পণ করিতেছে। উদ্দেশ্য—আত্মনিবেদন। উদ্দেশ্য—একবার মাত্র আমাকে দেখিয়া আমি আমিময় হওয়া।

রে বিন্দু বিন্দু প্রাণ আমার! রে খণ্ড চৈতন্য আমার! আর কতদিন বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকিয়া, সুখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত

বিক্ষত হইবে? আয় আয় ছুটিয়া মহাপ্রাণ-সমুদ্রের অভিমুখে। ভয় নাই! আপনাকে হারাইবে না। আপনাকেই পাইবে। এখন যেটুকু পাইয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, উহা দুঃখ মিশ্রিত, অতি অকিঞ্চিৎকর। উহাতে ইচ্ছার অভিঘাত আছে, অনভিলষিতের প্রাপ্তি আছে, জন্ম মৃত্যুর তাড়না আছে। রোগ শোকের অত্যাচার আছে। নৈরাশ্যের বেদনা আছে আর এখানে—কিছু নাই, অথচ সব আছে। পূর্ণ আনন্দ, কেবল অমৃত, কেবল অফুরন্ত স্নেহ, মাতৃ করুণার ধারা। আর আছে অব্যয় অচল জীবন—মহা সত্য।

হে পুত্রগণ! তোমরা সত্যে, প্রাণে ও চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, এইবার অজপাতে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হও। মাতা পুত্র সম্বন্ধ-বিহীন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বে উপনীত হও। "অয়মস্মি" বলিয়া সাধ্য সাধনার পরপারে চলিয়া যাও। তোমাদের শিরে শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক ও সফল হউক। তোমরা ধন্য হও।

ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।

গুকারঃ প্রথমো বর্ণশ্চান্ধকারপ্রকাশকঃ।
তন্নিরোধস্তু বিজ্ঞেয়ো গুকার ইতি বর্ণকঃ॥
তস্ম জ্ঞানীহি হে দেবি অন্ধকারনিরোধতঃ।
সত্যং সত্যং তথা সত্যং গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥॥

হে দেবি! "গু" এই বর্ণে অন্ধকার এবং "রু" এই অক্ষরে অন্ধকারের ধ্বংস বুঝায়। অতএব সত্য করিয়া বলিতেছি, অন্ধকার সংহারিত্ব নিবন্ধন "গুরু" এই অক্ষরদ্বয় দ্বারা অন্ধকারহারক তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

গুরুরিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে দেবি বর্ত্ততে।
তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠো বেদস্য কিং বৃথা॥

হে দেবি! যাহার রসনাগ্রে গুরু এই বর্ণদ্বয় বর্ত্তমান আছে, তাহার কোনরূপ অজ্ঞান থাকে না। গুরু এই মহামন্ত্র জপ দ্বারা যাদৃশ ফল হয়, বেদপাঠেও সেরূপ ফলের আশা নাই।

"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমায়ত, সাগর-লহর-সমানা॥"

হে গুরো,

সমুদ্র তরঙ্গে লহর-মালার ন্যায় সংসার তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া

তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। সেই উৎপত্তি লয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত চতুরানন ব্রহ্মা আবির্ভূত ও তিরোহিত হইলেন, কিন্তু তোমার আদি-নির্ণয় করিতে পারিলেন না। স্বয়ং বিধাতাই যখন সে তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তখন তৃণাদপি-তৃণতুচ্ছ মানুষ তাঁহার কি পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? সাধকগণ তাই গাহিয়াছেন,—

"কোটী কলপ ধরি, বিহি যদি বর্ণয়ে, তবহুঁ না পাওয়েত পার।
আকাশ পত্র' পরি, সিন্ধু সি পাত্র করি, কলপ কলপ জগজনে
জনে লিখ॥
এক বরণে তুয়া জগত ভরল হে, তাক না পাওয়ে দিখ।
বারিবিন্দু অত, ধরণী-ধূলি যত, কো যদি গণইতে পারে॥
সো তব তত্ত্বক, অন্ত না পাওয়ে, সিন্ধু পার—এ অপার।
অযুত নয়ন ধরি, আদি অন্ত হেরি, হোয় হোয়ব জন দেখ॥
বিশ্ব অশেষ কণ্ঠ, তাহে অনিপুণ, বিশ্ব-বাণী করি এক।
জগতে যত অন্তর আছয়ে, চিন্তা জ্ঞান করি এক॥
সো যদি ধ্যান-সমাধি আলাপয়ে, হিম-অচলে তৃণ-রেখ।
অন্ত নাহি তব—অন্ত নাহি তব, অনন্ত দেখ—তু অদেখ॥
তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক॥"

হে গুরো,

স্বয়ং বিধাতা যদি কোটী কল্প ধরিয়া তোমার মহিমার কীর্ত্তন করেন, তবু তাহার শেষ হয় না। আকাশকে যদি লিখন-পত্র করিয়া লওয়া হয়, মহাসমুদ্রকে যদি কালীর পাত্র করিয়া লওয়া হয়, তোমার নামের একটী

বর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়; তবুও তাহার পূরণ হয় না। জগতে যত বারি-বিন্দু আছে, এই ধরণীতে যত ধূলিকণা আছে, এ সকলের যদি গণনা করা সম্ভব হয়, তবু তোমার অনন্ত তত্ত্বের কিছুতেই অন্ত পাওয়া যায় না মহাসমুদ্র যদি পার হওয়া সম্ভবপর হয়, কিন্তু তোমার তত্ত্ব অপার। জগতে যত লোক জন্মিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই যদি অযুত অযুত নয়ন হয়, এবং তাহারা জীবনের আদি—অন্ত ধরিয়া যদি তোমাকে দর্শন করে, তবু তোমার আদি-অন্ত কেহই দেখিতে পায় না। এই বিশ্ব-সংসারে যত কিছু শব্দ বা বাক্য আছে, এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত প্রাণিকণ্ঠ যদি তাহাতেও তোমার বর্ণনা করে, তবুও তোমার বর্ণনায় কেহ সমর্থ হয় না। এইরূপ জগতে যত অন্তর আছে, তাহাদের সকলের চিন্তা ও জ্ঞান একত্র করিয়া যদি তোমার ধ্যান সমাধিতে নিয়োগ করা হয়, তবুও তোমার বর্ণনা হয় এইরূপ—যেমন 'হিম অচলে তৃণ-রেখ'; অর্থাৎ, এত করিয়াও হিমাচল পৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাদপি—ক্ষুদ্র তৃণ-রেখার ন্যায় মাত্র তোমার বর্ণনা করা হয়। অনন্তের যদি অন্ত পাওয়া সম্ভব হয়, তবুও তোমার অন্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি দয়া করিয়া নিজে যদি কাহাকেও জানাইয়া দাও, সেই তোমায় জানিতে পারে। যে তত্ত্ব এত দুরধিগম্য, তিনি স্বয়ং না জানাইলে যে তত্ত্ব কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই, সে তত্ত্ব কে বিবৃত করিতে পারে?

তরণীতে যেমন কর্ণধার আবশ্যক, বিদ্যার্থীর যেমন শিক্ষকের আবশ্যক, তীর্থ পর্য্যটনকারীর যেমন পাণ্ডার আবশ্যক;—তেমনি সংসার সমুদ্রে ভাসমান জীবন—তরণীর কাণ্ডারীর আবশ্যক। গুরুই শিষ্যের বা ভক্তের জীবন-তরণীর কাণ্ডারী। যুগে যুগে জীব-দুঃখ-বিগলিত-হৃদয় সেই পুরুষোত্তম গুরুরূপে মানব দেহ ধরিয়া শরণাগত, আশ্রিত,

ভক্তনারায়ণগণের মুক্তির পথে পরিচালন করিয়া এই মায়া মোহসঙ্কুল সংসারের ত্রিতাপ জ্বালার নির্ব্বান করেন। যুগে যুগে তাই যে মহূর্ত্তে বিশ্বমানবের প্রাণে শান্তি পিপাসা, মুক্তি ইচ্ছা জাগিয়াছে তখনই গুরুরূপী শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি অসংখ্য মহাপুরুষরূপে নরদেহ ধারণ করিয়া আপনার জীবন—শোণিতে বিশ্বমানবের ত্রিতাপজ্বালা ক্ষালন করিয়া মুক্তির অধিকার করিয়া দিয়াছেন।

অতএব এস ত্রিতাপজ্বালায় তাপিত জীব! কে আছ শান্তির পিয়াসী, মুক্তির ভিখারী, অন্ধ-বিশ্বাসের প্রার্থী! কে চাও জীবনকে শক্তি সামর্থ্যে, ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে, জ্ঞানে ধর্ম্মে মহিমা মণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য—এস সকলের আগে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর—শরণাগত হও তবেই তুমি পূর্ণনান্দ পাইবে। গুরুকে যে ব্যক্তি মনুষ্য ভাবে সে কখনও শান্তি পাইতে পারে না। গুরু বাস্তবিকই দেবাদিদেব মহাদেব এই অর্থ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলে তবে ত্রিতাপজ্বালা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। গুরুকৃপাতে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

শ্রীগুরুকে ভগবৎ-স্বরূপে পূজা করা ভক্তিশাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ। শ্রীগুরুতে ভক্তি আরোপ করিলে কামাদি দোষ সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। যথা—

"এতৎ সর্ব্বং গুরোর্ভক্ত্যা পুরুষোঽঞ্জসা জয়েৎ॥"

তাই বলি, হে বদ্ধ জীব! যদি ভব-সমুদ্র পার হইয়া যাইতে চাও, তবে শ্রীগুরুর চরণ-কমলে রতি-মতি স্থাপন কর। শ্রীগুরুকে অপ্রাকৃত

নিত্যরূপে সর্ব্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে। সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিলেই অধঃপাতে যাইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম ভাগবত উদ্ধবকে বলিয়াছেন :—

"হে উদ্ধব! আমাকে শ্রীগুরু-আচার্য্য স্বরূপ জানিবে। সুতরাং সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার অবমাননা করিও না; কিম্বা জরা-মরণ-ব্যাধি-প্রবণ-দেহ-বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া কদাচ তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর উপর দোষারোপ করিওনা, কেননা শ্রীগুরু সর্ব্বদেবময় অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি প্রভৃতি সর্ব্বদেবাত্মক। এইজন্য, অগ্রে শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ পূজা না করিয়া অন্য দেব-দেবীর পূজা করিলে নিস্ফল হয়।

ভক্তচূড়ামণি সাধক শ্রেষ্ঠ তুলসীদাস একদিন ধ্যান করিতে করিতে সম্মুখে গুরু ও গোবিন্দকে দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন ও গুরুকৃপাতে গোবিন্দ দর্শন হইয়াছে বুঝিয়া গুরুদেবকে অগ্রে প্রণাম করিয়া তদনন্তর শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করিয়াছিলেন :—যথা

গুরু গোবিন্ দোনো খাড়ে কিস্‌কো লাগি পায়।
বলিহারি গুরু তুহারি যো গোবিন্ দিয়া দেখায়॥

প্রেম ব্যতীত যেমন নন্দলালাকে পাওয়া যায় না তেমনি গুরুকৃপা-ব্যতীত শান্তি, অহৈতুকী ভক্তি বা পূর্ণানন্দ উপলব্ধি হয় না। অন্ধবিশ্বাসেই গুরুকৃপা লাভ হয়। তর্কাদি না করিয়া অবিচলিত ভাবে গুরু আদেশ পালন করিলে তবে অন্ধবিশ্বাস জন্মায়। জন্মান্তরের সুকৃতি ও বহুপুণ্যবলে কোনও কোন সাধকের অন্ধবিশ্বাস থাকে নতুবা অন্ধবিশ্বাস লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ও শ্রীশ্রীনামের শরণ লইতে হয়। বিশ্বাস পাকা হইলে তাহাকে "অন্ধবিশ্বাস" কহে।

রামকুটীরে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু আবির্ভাবের সময় বলিয়াছেন :—

সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায় বিশ্বাস। বিশ্বাস বৰ্দ্ধিত হইলে প্রেম হয়। অন্ধবিশ্বাসই মূল। অন্ধবিশ্বাস দ্বারা জগতে কোনও কার্য্য ব্যর্থ হয় না। যখনি কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় তখনি জানিবে তাহার মূলে অন্ধবিশ্বাস আছে। আর যেখানে কার্য্য ব্যর্থ বা বিফল সেইখানে অন্ধবিশ্বাসের সম্পূর্ণ অভাব তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ক্রোধ ও হিংসাতে বিশ্বাস নষ্ট করে কিন্তু "শ্রীশ্রীনাম" "অজপা" ও গুরুবাক্য দ্বারা অন্ধবিশ্বাস পরিপুষ্ট হয়। অন্ধবিশ্বাস যার আছে তার আর কোনও অভাবই থাকে না সে ভগবৎ তত্ত্বের পূর্ণ উপলব্ধি পায়।

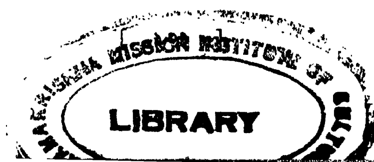
এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কি বলিতেছেন শ্রবণ কর :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥
মালী হ'এগ করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি পায়।
'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি 'পরমব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলক বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হ'এগ ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব—অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার সুখি যায় পাতা॥

তাতে মালী যত্নকরি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপসাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার' 'কুটীনাটী' জীব হিংসন।
'লাভ' 'পূজা' 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পা'ঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হ'ঞা মুলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল—রস করে আস্বাদন"॥

চৈ, চ মধ্য :১৯।১৫১—১৬৩

আমি তৃণাদপি ক্ষুদ্রা--গুরুতত্ত্ব বুঝাইবার বা কহিবার শক্তি সামর্থ্য সত্যই আমার আদৌ নাই তবু যে লিখিলাম ইহা কেবল শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে লিখিত হইল। হে দয়াল ঠাকুর সদ্‌গুরু, তোমার শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম। যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অচল অটল বিশ্বাস ভক্তি থাকে এই আমার প্রার্থনা। প্রভু, দিন থাকতে বলিয়া রাখিলাম দেখো শেষের দিনে যেন ভুলে না



যাই। বিশ্বাসহারা হ'য়ে আজ আমি কর্ম্মফলে প্রপীড়িতা—ব্যথিতা, ক্লিষ্টা ও অপরাধী আর যেন বিশ্বাসহারা না হই দেব, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা অজপা-কল্পতরু পুস্তকে থাকিল।

হে ভক্তনারায়ণগণ! যদি ভবব্যথা হইতে মুক্ত হইতে চাও তবে কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুরক্ত হও। তোমার দরদী, মরমী ব্যথার ব্যথী, শোকে শান্তিদানকারী, বিপদে ত্রাণকারী, দুঃখের সান্তনা-কারী প্রাণারাম সখা, বন্ধু, পিতা মাতা, পতি, হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন যদি চাও তবে শুন, তিনিই জগৎগুরু সদ্‌গুরু গুরুরূপে অধিষ্ঠান। তাঁর আশ্রয় লইয়া অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হও।

তুমি গৃহীই হও—বিদ্যার্থীই হও, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীই হও, ধনবান্ বা গরীবই হও, রাজা হও, ভিখারী হও, পাপী হও তাপী হও, শোকী হও বা দুঃখীই হও—যে যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন—শ্রীশ্রীগুরু-দেবের শরণাগত হইয়া ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও, তোমার জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—গুরু-কৃপায় তুমি নিশ্চয়ই শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হইবে ইহাই আমার নিবেদন।

যিনি দীক্ষা, অজপা, বা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া থাকেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য—শ্রীশ্রীগুরুদেব। সেই মহাপুরুষের শ্রীশ্রীপাদপদ্মে আমার কোটী কোটী প্রণাম। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অচল অটল, বিশ্বাস ভক্তি থাকে এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিতা

শ্রীবৈষ্ণব-পদরেণু-ভিখারী—

"অমিয়"।

গুরু বন্দনা

ভবসাগর-তারণ কারণ হে !
রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে !
শরণাগত কিঙ্কর ভীত-মনে,
গুরুদেব ! কৃপাকর জ্ঞানহীনে ॥ ১

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে !
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে !
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব ! দয়াকর দীনজনে ॥ ২

মন বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুস হে !
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব ! কৃপাকর জ্ঞানহীনে ॥ ৩

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে !
মম মানস চঞ্চল রাত্র-দিনে,
গুরুদেব ! দয়াকর দীনজনে ॥ ৪

রিপুসুদন-মঙ্গল-নায়ক হে !
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে।
ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে
গুরুদেব ! কৃপাকর জ্ঞানহীনে ॥ ৫

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে !
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে !
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব ! দয়াকর দীনজনে ॥ ৬

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে !
পতিতাধম-মানব-পাবক হে !
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে,
গুরুদেব ! কৃপাকর জ্ঞানহীনে ॥ ৭

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে !
ভবরোগ- বিকার-বিনাশক হে !
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব ! দয়াকর দীনজনে ॥ ৮

শ্রীগুরুস্তোত্রাণি।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদগুরুং নিত্যমহং নমামি॥ ৩

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৫

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৬

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৭

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৮

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১০

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকং।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময় ॥ ১১

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুং।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতং ॥ ১২

পরাৎপরতরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকং।
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভং ॥ ১৩

মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণঃ মদ্দেহো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৪

গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম ॥ ১৫

গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃ মধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্মাতা নমস্তেঽস্তু মাতৃগুরুং নমাম্যহম ॥ ১৬

শ্রীমৎপরংব্রহ্মগুরুং বদামি।
শ্রীমৎপরংব্রহ্মগুরুং স্মরামি ॥
শ্রীমৎপরংব্রহ্মগুরুং ভজামি।
শ্রীমৎপরংব্রহ্মগুরুং নমামি ॥ ১৭

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥ ১৮

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥ ১৯

—:—

গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।
পাশনাশ হেতুরেব নতু বিচার বাক্ বলং।
গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।
বিবিধ শাস্ত্র জল্পনেন ফলতি নাথ কিম্ ফলং।
তব কৃপাং বিনা ন ভাতি মনসি তত্ত্বাজ্জ্বলম্।
গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্॥
শ্রুতি পুরাণ তন্ত্রতো ন যাতি চেতসো মলং।
দর্শনস্য দর্শনেন ন মনো হি নির্ম্মলং।
গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্॥

—:—

প্রণমামী গুরুদেব, পূর্ণব্রহ্ম আপি হো,
আপি বিষ্ণু, আপি শিব আপি গণপতি হো ॥
আপি অন্নপূর্ণা মায়ি, আপি কালী মায়ি হো,
আপি দুর্গা, আপি তারা, আপি গঙ্গামায়ি হো ॥
আপি মেরি প্রাণ গুরু, আপি মেরি ধ্যান হো,
ভুখে অন্ন, পিয়াসে পানি, আপি মেরি জ্ঞান হো ॥
(আপি মেরি জান হো।)
(আপি মেরি প্রাণ হো ॥)

॥ ওঁ তৎসৎ গুরু ওঁ ॥

ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।

অজপার অনুভূতি।

বিরাট সৃষ্টির মাঝে লীলার একটা মধুর আনন্দপ্রবাহ চ'লেছে—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। সে লীলা সৃষ্ট ও স্রষ্টার মধ্যে। নিত্য আদি পুরুষ গোবিন্দ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের স্বতঃই আনন্দের স্ফূর্ত্তি জাগ্‌ল। তাই তিনি সেই আনন্দ আস্বাদন কর্‌বার জন্য বহু হ'লেন। এই বহু আবার সেই একে গিয়ে লয় হয়।

বিশাল বারিধিবক্ষে ঢেউ উঠ্‌ল, বায়ুর আন্দোলনে উথ্‌লে উছ্‌লে, কলকলে, ছলছলে, আছ্‌ড়ে পড়্‌ল—এক চন্দ্রের পরিবর্ত্তে শত চন্দ্রের উদ্ভব হ'ল। যত ঢেউ তত চন্দ্র। প্রত্যেক ঢেউই ইন্দুশেখর, শত ইন্দুশোভা হ'ল বারিধির বক্ষে। আবার যখন বারিরাশি শান্ত হ'ল—স্থির, নীরব, নিথর—তখন আবার সেই গগনে এক চন্দ্র, আর জলে তারই ছায়া। কিন্তু ঐ শান্ত বারিরাশির বুকের মধ্যে এক্‌কে ভেঙ্গে বহু করার যে একটা অদম্য শক্তি গুমরে উঠ্‌ছে—তা ক'জন বুঝে! সূর্য্য উঠ্‌ল চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়্‌ল সারাদিনের খেলাধূলার পর সন্ধ্যায় শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে তারা যখন বলে, 'আর পারিনা প্রভু'

সূর্য্য অমনি তাঁর লীলা সম্বরণ কর্‌লেন। সমস্ত দিন যে সব আলোর কণারা সংসারের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সব একের মধ্যে মিলিয়ে গেল। প্রলয়ের সামন্তগুলি, শিবের প্রমথরা, নৃত্যশেষে শান্ত যোগী দেবাদিদেব মহাদেবের রুদ্রাক্ষের মধ্যে লয় পাচ্ছে। সব একাকার,—একটা—একমাত্র।

এইতো সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রহস্য—এইতো নিত্য লীলা। এই লীলার মধ্যে আমাদের প্রবেশ কর্‌তে হ'বে। বিশ্বসংসার জুড়ে এই লীলা চল্‌ছে।

এই হচ্ছে চৈতন্যের লীলা। অখণ্ড চৈতন্য পরব্রহ্মেরই ছায়া জীবের মধ্যে বহু হ'য়ে প্রকাশ হয়েছেন। কিন্তু অনুভবের প্রয়োজন;—ধারণা কর্‌তে হ'বে। এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে বিরাটকে, সেই ভূমা পুরুষকে, তাঁর নিত্য লীলাকে ধ'রে রাখ্‌তে হবে।

এই লীলা-প্রবেশের উপায়, এই চৈতন্যলীলা উপলব্ধির উপায় একমাত্র 'অজপা' লক্ষ্য করা। কারণ অজপাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিত্য ও শাশ্বত।

সৃষ্টির প্রথম আরম্ভ হ'তে স্রষ্টা মহাবিষ্ণুর বুকের মাঝে যে আনন্দ স্পন্দন জেগে তাঁর হৃদয়ের উপরের কৌস্তুভমণিকে দোল দিতেছিল, সেই স্পন্দন সমস্ত সৃষ্টিতে নিত্য স্পন্দিত হ'চ্ছে। এই স্পন্দনের সুরের সাথে নিজের সুর মিলাতে হ'বে। তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, স্থাবর জঙ্গম, নভঃস্থলে ঐ একই স্পন্দন,—ঐ একই আনন্দপ্রবাহ—কিন্তু বিভিন্নরূপে। জীবের মধ্যে চৈতন্য শ্বাসরূপে অবস্থিত। কাজেই জীবের অবস্থা ঠিক্ শূন্য কুম্ভের অনুরূপ। কুম্ভের মধ্যেকার বায়ু বল্‌তে পারে যে সে একাকী ও বাহিরের বায়ুসমুদ্র হ'তে বিভিন্ন।

কিন্তু বায়ুসমুদ্রের তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত তো তাতেও তরঙ্গের উদ্ভব ক'র্‌ছে, বিরাট চৈতন্ত-সমুদ্রের মধ্যেও জীব তেমনিভাবে ডুবে আছে ; এবং তা'র শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার তরঙ্গের উৎপত্তি বিরাট চৈতন্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ হতেই। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পন্দনই অজপা। এই স্পন্দনে আমাদের চিত্ত স্থির কর্‌তে পার্‌লে, তবেই আমরা সেই লীলাময়, সেই আনন্দময় পুরুষের সন্ধান পা'ব।

এই অজপা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বতঃস্ফুরিত। সদ্‌গুরু বলেন "দেহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অনবরত প্রাণশক্তির ক্রিয়া চল্‌ছে। এই ক্রিয়ায় প্রাণবায়ু মূলাধার হ'তে উঠে আজ্ঞাচক্র অবধি গমনাগমন কর্‌ছেন। প্রতি জীবের অষ্ট প্রহরে ২১,৬০০ বার এই প্রাণশক্তির ক্রিয়া চল্‌ছে।" এই হচ্ছে সহজ কথা।

আমরা যদি পরমেশ্বর পরমব্রহ্মের মহত্ত্বের মধ্যে তাঁর সর্ব্বব্যাপকত্বের ধারণা করি, তাহ'লে উপলব্ধি হয়; তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্রবিদ্যমান। কিন্তু আমরা তাঁ'র শক্তির পরিচয়েই তাঁ'কে উপলব্ধি করি। এই শক্তিই প্রাণশক্তি ; আর ইনিই 'হংসবাহিনী ব্রহ্মাণী সরস্বতী'। 'হংসবাহিনী' কথার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর স্থির চিত্তে লক্ষ্য কর্‌লে 'হংসঃ' এই শব্দ স্বতঃই উচ্চারিত হইতেছে এইরূপ উপলব্ধি হয়। সূক্ষ্মে প্রতি শ্বাসের উচ্ছ্বাসে বা উত্থানে 'সঃ' এবং পতনে 'হং' এইরূপ ধ্বনির অনুভব হয়। প্রাণশক্তি এই 'হংসঃ' মন্ত্রের উপর বিরাজ করেন বলিয়াই তিনি হংসবাহিনী। আর তিনি 'সরস্বতী' অর্থাৎ সরস্বতী যাহা হইতে স্বরের উৎপত্তি। প্রাণ হইতেই বাকের উৎপত্তি। সেইজন্য এই প্রাণশক্তিই হংসবাহিনী বাগ্দেবী বা ব্রহ্মানী সরস্বতী। এই শক্তিকে আরাধনা করিয়াই আমরা সেই পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করিব।

আবার 'অজপাই ব্রহ্মবিদ্যা' কারণ ইনিই ব্রহ্মশক্তি, যা নিত্য প্রতি জীবের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের সাড়া জাগিয়ে রেখেছেন। আর একমাত্র এই অজপা অভ্যাস ও লক্ষ্য দ্বারাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের জ্ঞান ও ধারণা সম্ভব।

আমাদের পূজনীয় গুরুদেব (শ্রীমৎ অপূর্ব্ব ঠাকুর) তাঁ'র করুণামাখা উপদেশাবলীতে অজপার সহিত জপ করিবার জন্য নানাবিধ মন্ত্রাদির কথা বলিয়াছেন। তিনি অজপার সহিত 'সীতারাম', 'রাধাকৃষ্ণ', 'হ্রীং হৌং', 'সৎ গুরু', 'হং সঃ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মূলাধারে জীবের বা আত্মার স্থান, এবং আজ্ঞাচক্রে পরমাত্মার স্থান। মূলাধারে কামনারূপ জলতত্ত্বের মধ্যে নিমজ্জমান চতুষ্কোণ ধরামণ্ডলে জীবের বাস। সে সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব স্মরণ ক'রে শ্বাস চৈতন্য বেয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হ'বার চেষ্টা করছে। প্রতি শ্বাসের উচ্ছ্বাসে প্রকৃতি ছুটে চ'লেছে পুরুষের সাথে মিলনের তরে আকুল হয়ে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সে নিম্নাভিমুখী কামনার আকর্ষণ কাটাতে পারছে, ততক্ষণ তাহার অব্যাহতি নাই। প্রতিবারেই তা'কে পূর্ব্বাবস্থায় হতাশ হ'য়ে পরমাত্মাকে স্মরণ করতে করতে ফিরে আসতে হ'চ্ছে। প্রতিবারেই আজ্ঞাচক্রে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী করুণস্বরে ডাকছে "রাধে রাধে" —প্রতিবারেই প্রকৃতিরূপা জীব শ্বাস-চৈতন্যরূপে তাঁ'র কাছে যাবার জন্য আকুল প্রাণে ছুটে চ'লেছে, কিন্তু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলতে বলতে আবার নিজ কুঞ্জেই ফিরে আসছে, এই লীলা নিত্য। কিন্তু যখন সে সকল বিষয়কামনারূপ বৈভব ত্যাগ ক'রে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ব'লে সেই নীলসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখনই 'রাধা-কৃষ্ণের' মিলন—অখণ্ড আনন্দ! তখনই সাংসারিক কথায় সাধকের সমাধি। রাধা-কৃষ্ণের

নিত্যলীলা স্মরণ ও অজপার সহিত এই মন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণপ্রেম ও শান্তিপূর্ণ আনন্দ সাধক লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

প্রতি মন্ত্রেই এইরূপে আমাদের প্রকৃতিরূপা জীবের সহিত পরম পুরুষের মিলনের কথা স্মরণ কর্‌তে হ'বে। আর তাঁদের লীলা স্মরণ কর্‌লে সেই ভাবনা বা ধ্যান আরও গাঢ় হ'বে।

এই নিত্য ও সত্যে বিশ্বাস রেখে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন কর্‌তে হ'বে। জীব নিজের চেয়ে কাউকে বেশী ভালবাসে না, সেইজন্য নিজের আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করে। যেখানে বিশ্বাস সেইখানেই প্রেম, আর যেখানে যত প্রেম সেইখানেই তত নিঃসন্দেহতা ও নির্ভরতা। 'গুরুকৃপায়' বিশ্বাস ও প্রেমই আমাদের সম্বল, এই সম্বল নিয়েই নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলন কর্‌তে হ'বে। অজপা আপনা হ'তেই স্পন্দিত হ'চ্ছে। যে কোন অবস্থায় যেরূপভাবেই দেহে জীবের যতদিন বাস, ততদিন প্রাণশক্তির ক্রিয়া তা'র মধ্যে জীবনের প্রবাহ জাগিয়ে রাখ্‌বেই। সর্ব্বদা বিদ্যমান, নিত্য স্বাভাবিক এই অজপা, তা'তে লক্ষ্য ও নিজের চিত্ত অবিদ্যা হ'তে ফিরিয়ে নিয়ে তা'র প্রতি একাগ্রতা সহকারে নিয়োগ করাই অজপার সাধনা।

কাণের কাছে যখন মৃত্যুর বিষাণ বাজ্‌বে—সমস্ত সংসার যখন জীবকে বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত, তখন যে ইন্দ্রিয় এখন সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও কার্য্যতৎপর ব'লে প্রতীয়মান, তা'রা সকলেই আগে ছুটি চাইবে। কিন্তু এই মরদেহ ত্যাগের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তির ক্রিয়া অব্যাহত থাক্‌বে। যে আজ অজ্ঞানতঃ উপেক্ষিত, সে কিন্তু তখনও অভ্যাসমত নিজের স্বরূপ চিন্তা কর্‌বে, পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে তখনও স্মরণ কর্‌বে। তাই এই অকিঞ্চনের সকাতর অনুরোধ—জীব জাগ,

উঠ, প্রবুদ্ধ হও। ত্রিপুটি জ্ঞান লাভ ক'রে ধন্য হও। তোমার বিশ্বলীলায় আসা সার্থক কর। আনন্দ, চিরস্থায়ী শান্তিপূর্ণ আনন্দের তরে সংসার ছুটে চ'লেছে—কিন্তু কোথায় চ'লেছে তা ক'জন জানে? সংসারের মোহে নিজেকে হারিয়ে মানুষ ভাবে "বেশ আছি"। কিন্তু নর্ত্তনশীল কালভৈরবের প্রতি চরণবিক্ষেপে সে যে এগিয়ে চল্‌ছে তা সে বুঝ্‌তেই পারছে না। অনেকদূর যেতে হ'বে, অনেকদূর এসেছি ও—কিন্তু ভুলপথ ধ'রে এসেছি। পথের কোনও পথিকই তো আমায় ভুলে দরদ দেখায় নাই। কারুর মনই তো আমার তরে সহানুভূতিতে কোমল হয় নাই। কিন্তু আজ আমি বৃন্দাবনের যাত্রীদের সঙ্গ পেয়েছি, নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছি। আমার প্রাণের ব্যাকুলতার সাড়া পেয়েছি। বৃন্দাবনবিহারীর আশ্বাসবাণী পেয়েছি। তাই ছুটে চ'লেছি। এস কে আস্‌বে এসো। যমুনাপুলিনে বৃন্দাবনের আনন্দ লহরের খোঁজ পেয়েছি আজ। নটবর বংশীধারীর ডাক্ এসে পৌঁচেছে আজ। এসো, এসো, কে আসবে এসো।

বৈষ্ণব চরণাশ্রিত

শ্রীসুধীরকুমার সিংহ।

গীতাবলী

গীতাবলী।

(১)

*জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে তোমায় মোরা চেয়েছি।
হৃদয়ভরা বেদনা নিয়ে তোমায় হৃদে পেয়েছি॥
ফুলের হাসি উষার আলো, ভূষার মত নিয়ত ঢাল।
কত যে মোদের বেসেছ ভাল, তোমারি গানে গেয়েছি॥
দুখানলে দহন ক'রে, নিলে মোদের আপন ক'রে,
পাশে রেখে যাবে না স'রে, সে আশা আজ পেয়েছি॥
আপনহারা গানের তানে, ভুবনভরা সুরের জালে।
মোদের চিত্তকমল দিয়ে তোমায় মোরা ছেয়েছি॥
আঁধার রাতে জ্বালায়ে আলো মোদের তরে করুণা ঢাল।
ভুবনভরা সুধার স্রোতে (মোরা) ভাসিয়া কূল পেয়েছি॥

---

(২)

প্রাত সময়ে যশোমতি জাগাওয়ে উঠ নন্দলালাজী।
বৃন্দাবন্‌মে কুসুম কাননমে ভ্রমরায় হরিগুণ গাওয়েজী॥
ধড়া পরাওয়ে, চূড়া বাঁধাওয়ে, ক্ষীরসরনবনী খাওয়েজী।
শ্রীদাম সুদাম ডাক সুবল সখা ডাক, ডাকওয়ে দাদা বলাইজী॥
বেণু বাজাওয়ে, ধেনু চরাওয়ে, কৃষ্ণ গোঠে যাওয়েজী।
রাম নাম রাম নারায়ণ, তারকব্রহ্ম নাম করজী॥

---

(৩)

বিশ্বাসে গেঁথেছি মালা পরব' মাগো আপন গলে,
আত্মসহ দিব মাগো, দিব তোমার চরণতলে ॥
ভক্তি-পুষ্পে গাঁথিয়াছি, প্রেম-চন্দন মাথাইয়াছি,
বিবেক-সূতে গাঁথি মালা, দিচ্ছি মাগো আপন গলে ॥
ঈষা, মূষা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ব'সেছে মা যেই কোলে,
নিবি নাকি আমায় সেথা, আমি যে তোর অবোধ ছেলে ॥
মা ব'লে মা ডাক্‌ব যখন, দেখ্‌ব মা তুই থাকিস্ কেমন,
বাছা ব'লে ধ'রে তুলে নিবি যে মা আপনি কোলে ॥
নিজে তুই কি আসিস্ তারা, ভক্তে তোরে আনে ডেকে,
আন্‌ব তোরে আত্মবলে, দেখ্‌ব' কেমন থাকিস্ ভুলে ॥
কোলে নিবি ব'লেছিলি, ফাঁকি দিয়ে কোথা গেলি,
ফাঁকি আর খাটবে না মা, ডাক্‌ছি এই যে মা মা ব'লে ॥
মা মা ব'লে ডাকব যখন, দেখ্‌ব' মা তুই থাক্‌বি কেমন ॥
ডাকার মত ডেকে এনে, লাফিয়ে উঠ্‌ব' ঐ কোলে ॥

---

(৪)

শরণমে আয়া হ্যায় হাম্ তুম্‌হারি—
দয়া কর হে দয়ালু ভগবান।
হাম্ তো বালক আপ্ তো পিতা—
দয়া করহে দয়ালু ভগবান।
আপ্ তো ঠাকুর হাম্ পূজারী—
দয়া করহে দয়ালু ভগবান।

চায় পাপী হোয়ে চায় যোহি হোয়ে—
দয়া করহে দয়ালু ভগবান।
চায় দুষমন্ হোয়ে চায় যোহি হোয়ে—
দয়া করহে দয়ালু ভগবান।
দেহ মুকতি দেহ ভকতি—
দয়া করহে দয়ালু ভগবান॥

---

(৫)

তুমি প্রাণরমণ, হৃদয়রঞ্জন, করুণাময় স্বামী—
আমি মোহে অভিভূত, পাপে কলঙ্কিত, তথাপি তোমারই আমি।
আমার নয়নের জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কণ্ঠ মাঝে তুমি বাণী—
আমার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন সকলেরই মূলে তুমি—
আমার বাহুতে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, মনোমাঝে চিন্তামণি—
আমি মোহে অন্ধ হ'য়ে তোমায় না ভজিয়ে,
করিতেছি—আমি আমি।
আমার দাও খুলে আঁখি, নয়ন ভরে' দেখি—
তুমি প্রাণ আমি প্রাণী।
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পায়, না কর যদি হে ক্ষমা—
তবে দিও হে দিও ও প্রাণপ্রিয় বেদনা নব নব।
(আমি) তোমারি (দেওয়া) বেদনা "আশীষ কুসুম" বলিয়া
মাথায় পাতিয়া লব॥

---

(৬)

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ ।

ঘুমালে যে জেগে থাকে, সেই তোমারি গুরু বটে,
সে আছে দেহের মাঝে, ভালবাস অকপটে ॥
জীবে চলে বলে ফেরে, শুধুতো তাহারই জোরে,
সুখ দুঃখ আদি করে, সকলি ঘটায় এ ঘটে ॥
করিলে তার সাধনা, সকলি যাইবে জানা,
হবে না আর আনাগোনা, ভব সংসার সঙ্কটে ॥
যে দিনে সে ছেড়ে যাবে, তোমাকে শব করিবে,
কেনা বেচা সব ফুরাবে (তোমার) এত সাধের ভবের হাটে ॥

(৭)

মা আছেন আর আমি আছি, ভয় কি আছে আর আমার,
মার হাতে খাই পরি, মা নিয়েছেন আমার ভার ॥
(পড়ে) সংসার পাকে ঘোর বিপাকে, যখন দেখি অন্ধকার,
সেই ঘোর আঁধারে মা আমারে, মাভৈঃ বাণী শুনায় বারেবার ॥
(এসে) ছয় জনাতে একই সাথে, পথ ভুলায় যে কতবার,
সেই বিপদ হ'তে ধ'রে হাতে, মা মোরে করেন উদ্ধার ॥
আমি ভুলে থাকি তবু দেখি, ভোলে না মা একটীবার,
এমন স্নেহের আধার মা যে আমার, আমি যে মার মা আমার ॥

(৮)

(আমি) সাধনারি পথে চাহি মা চলিতে
কে যেন আমারে দিতেছে ঠেলে।
মনে নাহি করি কে যেন করায়
কেন করি শ্যামা দাওগো ব'লে ॥
মায়া মোহ আদি আছে কত নদী
আতঙ্কে ডরাই ভয়ে কাঁপে হৃদি
ভীষণ তরঙ্গ হেরে আঁখি মুদি
"তারা" পদ তখন যাইগো ভুলি ॥
প্রলোভন পথ আছে শত শত
তাহে প'ড়ে তারা হই হতাহত
বাসনা সতত ভুলাইছে পথ
কেমনে বিজনে যাই মা চলি ॥
কামরূপ গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ ধরি
পথ রুধি তা'রা আছে সারি সারি
আশা পরিহরি কিসে ধৈর্য্য ধরি
চাহ মা শঙ্করী অপাঙ্গ তুলে ॥
মদমত্ত করী অতীব প্রবল
গহন কানন শ্বাপদ সঙ্কুল
ক্রোধরূপে জলে ভীম দাবানল
বুঝি মা অনলে মরি মা জ্বলে ॥
অবোধ সন্তান (মা তোর) ভাসে আঁখি নীরে
প্রাণের ভিতরে কি যেন কি ক'রে
থেকো মা অন্তরে এস মা অন্তরে
অকৃতি অধম পামর ব'লে ॥

(৯)

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ—তাল জলদ একতালা।

ও মন মালিক যে তোর ঘরে।
বৃথা খুঁজিস কেন দূরে দূরে॥
ঘর না খুঁজে বাইরে গিয়ে, খুঁজে খুঁজে হায়রান্ হ'য়ে।
সাধের জীবন যায়রে ব'য়ে আপন কর্ম্ম ফেরে॥
দিবানিশি সে তোমারে, ডাকছে মৃদু মধুস্বরে।
(তুমি) কানার মত ইতস্ততঃ দিন কাটালে ঘুরে ঘুরে॥
বলদ যেমন বয়রে চিনি, জানেনা তার স্বাদ কেমন।
তুইও তেমনি মরিস ব'য়ে স্বাদ ভোগে তার অন্য পরে॥
অপূর্ব্বেন্দ্র বল রে মন, হৃদয় ঘরে যাওরে এখন।
ঘরের মালিক দেখ্‌বে ঘরে আনন্দ পাবে অন্তরে॥
আপনাকে না জানে যে জন।
তার পর জানা কি হয়রে কখন
আপন খবর জানে যে জন সেই জানে সে কতদূরে॥

---

(১০)

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

সাধু গেল গেল বহে গেল কাল,
প্রাণরূপী হংসা তাহারে সামাল।
না ক'রে সাধন, গেলরে জীবন,
(তবু) গুরুবাক্যে তোর হ'ল না খেয়াল॥

মাতৃগর্ভে যখন তাঁহারে হেরিতে,
উর্দ্ধ জিহ্বা করি আনন্দে ভাসিতে।
কর-যোড় করি কত কি বলিতে
তব সাধনায় কাটাইব কাল ॥

সে সকল কথা কেন গেলি ভুলে,
দারাপুত্র ল'য়ে আছ কুতূহলে।
বল তুমি খোকা হ'লে কতবার,
(তোর) খোকা হওয়া সাধ রবে কত কাল ॥

---

(১১)

হের হর-মনমোহিনী
কে বলেরে কালো মেয়ে
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো
চোক থাকেতো দেখনা চেয়ে
বিমল করে শোভে অসি
অরুণ পরে নখে খসি
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী
কমল ভ্রমে, ভ্রমর ভ্রমে
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

---

(১২)

মা মা রবে মন সুখে
মন ত্রিতন্ত্রী বাজাও রে ।
মায়েরি রচিত সুমধুর বীণা
বাজায়ে "মা" নাম গাও রে ॥

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ঘেরি
স্বার্দ্ধ ত্রিকোটা তন্ত্রী সারি সারি
তা'রা বাজিছে নিয়ত মা মা রবে
তব বীণার ভিতরে শুন রে ॥

শরীরে ধূর্জ্জটি মন্ত্র হ'তে উঠি
মধ্যগ্রামে মন যাওরে ছুটি'
ক্রমে তারাপুরে উঠি তারস্বরে
"তারা" "তারা" নাম কর রে ॥

ত্যজিয়ে আকার অকার মকার
মা নামের আগে দিয়ে অলঙ্কার
বাজাও মোহন বাঁশী বার বার
ভুবন ভরিয়া উঠুক রে ॥

মূলাধারে আছেন নিদ্রিতা যোগিনী
বক্রগ্রীবা সেই "কুলকুণ্ডলিনী"
তব বীণার ঝঙ্কারে সুষুম্না দেবীরে
জাগায়ে প্রসন্ন কর রে ॥

———

(১৩)

কীর্ত্তন।

তোমারি ভাবেতে, ভাবিনী যে জন,
তার কি ভাবনা নাথ।
সে যে অভাব সাগর, হইয়াছে পার,
ভাবেতে বিভোর চিত॥
ভয় কি ভাবনা, জানে না সে জনা,
সদানন্দে মন মত্ত।
চিদানন্দ রসে নাচে খেলে হাসে,
আছে ভাবেতে মোহিত॥
অপূর্ব্বেন্দ্র বলে, তব প্রেমানন্দ,
এক বিন্দু পেলে পরে।
(সে যে) কি আনন্দ ধরে, ভাবেতে না ধরে,
সে ভাব যে ভাবাতীত॥

(১৪)

সাধে কি পড়েছে ভোলা শ্যামা মায়ের চরণতলে
কটাক্ষেতে চায় মা যারে সেই তো ত্রিতাপ জ্বালা ভোলে
মায়ের এক রূপেতে জগৎ আলো, পা দুটীতে শান্তি ঢালা
জুড়াতে শিব বিষের জ্বালা, রেখেচে চরণ হৃদ্ কমলে
ভাব দেখি মন শ্যামা কি ধন ব্রহ্মা বিষ্ণু করে সাধন
না জেনে কি ইন্দুভূষণ ক্ষেপির প্রেমে গেছে ভুলে।

(১৫)

তোমাতে যখন মজে মোর মন
আর কিছু ভাল লাগে না।
ভুবন স্বপন- সম হয় জ্ঞান
থাকে না অন্য ভাবনা

দারা সুতা সুত, বন্ধু পরিবার,
সব ভুলে যাই, একি চমৎকার,
কে আমি কে তুমি, থাকে নাকো জ্ঞান,
ডুবে মন প্রাণ ভাবেতে অজ্ঞান
এ ঘটে কি ঘটে জানি না॥

তব রূপরাশি দেখিতে দেখিতে
উদাস অন্তর উন্মত্ত প্রেমেতে,
(আমি) নিমেষে নিমেষে দেখি নব রূপ
অমিয় রসকূপ একি অপরূপ
(দেখে) আঁখি কোন মতে ফেরে না॥

আনন্দে আনন্দ বাড়ে প্রতিক্ষণে
দশেন্দ্রিয় থাকে শূন্যেতে বন্ধনে
রিপুচয় পরাজয় সকলি আনন্দময়
অনুভব মাত্র রয় আর সব পায় লয়॥
(যেন) জীবনে জীবন থাকে না॥

(১৬)

তোরা আয় রে, চলে আয় রে,
কে যাবি আনন্দ বাজারে।
[তথা] গেলে ভুলে রবি, ফিরিতে নারিবি,
আনন্দেরি খেলা হেরেরে॥

আনন্দে দোকানি করিতেছে ধ্বনি,
কে নিবিরে তোরা কে নিবিরে কিনি।
বিশ্বাসের মূলে সদানন্দ মেলে,
নিরানন্দ কভু হবে না অন্তরে॥

সদানন্দ হেথা দোকানির সেরা,
তাহারি ধনেতে এ বাজার গড়া।
সদানন্দ মনে বেচা কেনা করা,
করিতেছে সদা অন্তরে অন্তরে॥

ভবেরি বাজারে বেচা কেনা ক'রে,
দিবানিশি দুঃখ পাওরে অন্তরে।
এলে এ বাজারে দুঃখ যাবে ছেড়ে,
সদানন্দে ধন ক্রমে যাবে বেড়ে॥

অপূর্ব্বেন্দ্র বলে বলিরে আদরে,
দুঃখী তাপী তোরা আয় ত্বরা ক'রে।
গেলে সে বাজারে দুঃখ যাবে ছেড়ে
চির সুখ শান্তি মিলিবে অন্তরে॥

---

(১৭)

মোর কেহ নাই তাতে দুখ নাই
যদি হও তুমি আপনার।
মোর কিছু নাই তাতে ভয় নাই
যদি ভাগী কর তব করুণার॥
(ভবে) মান অপমান যশ অপযশ
যা ঘটে তা ঘটুক আমার।
নাই কোন ভয় অভয় তোমার
পদ যদি পাই একটীবার॥
অভাব বিপদ যত পারে হউক
অনাহার সহি অনিবার।
তব নাম যদি না যাই ভুলিয়া
উপশম হবে যাতনার॥
জীবনে না হয় মরণেও যদি
দরশন পাই মা তোমার।
(তবে) ত্রিতাপে জ্বলিয়া ছাই হই যদি
ক্ষোভ নাহি তায় অপূয়ার॥

---

(১৮)

কেবা চিন্‌তে পারে তোমায় ওগো অচিন্ত্যরূপিণী
মায়াতে জগত ভুলাও মা ত্রিজগত নিস্তারিণী
(ত্রিজগত নিস্তারিণী হরহৃদি বাসিনী)
আশ্বিনে হওমা অম্বিকে, কার্ত্তিকে হও মা কালিকে,
অগ্রহায়ণে হওমা তুমি গণেশ জননী॥

পৌষে লক্ষ্মীবরদা, মাঘে বাক্‌বাদী দেবতা,
ফাল্গুণেতে হওমা তুমি শ্রীরাধা বিনোদিনী
চৈত্রে হওমা বাসন্তী, বৈশাখে প্রখরা চণ্ডী,
জ্যৈষ্ঠ মাসে মঙ্গল চণ্ডী মা, আষাঢ়ে রথবাহিনী ॥
শ্রাবণে ঝুলনায় ঝোল, ভাদ্রেতে জন্ম হ'লো ;
সেইজন্য লোকে বলে মা ত্রিজগত নিস্তারিণী ॥

---

(১৯)

তুমি তপোরাশি, তুমি তপোময়।
তুমি তপোমূর্ত্তি, জ্ঞানের নির্ণয় ॥
অনাদি অনন্ত পুরুষ উত্তম।
নয়ন সম্মুখে তুমি আজি মম ॥
তোমারে স্মরিয়ে প্রভু নারায়ণ
নিখিল জগত করি দরশন ॥

---

(২০)

নয়নে রেখেছি ধারি রূপ নেহারিতে।
শ্রবণে রেখেছি ধারি তব গুণ শুনিতে ॥
করেরে করেছি ধারি ও চরণ সেবিতে
চরণে রেখেছি ধারি মন্দিরে যাইতে
মনেরে করেছি ধারি জড়াইয়ে ধরিতে
প্রাণটী রেখেছি শুধু দক্ষিণা দিতে ॥

---

(২১)

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি!
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মানিক হারানু হেলে।
নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম;
মানিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মানিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত,
মরমে বহল শেল॥

---

(২২)

পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে, ভাবের বসতি,
তাহার উপরে লাভ॥

প্রেমের মাঝারে, পুলকের স্থান,
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে, ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা॥

ফুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ—উপরে, এ তিন আখর,
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ॥

ফুলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি,
ইহা জানে কেহ কেউ॥

দুঃখের উপরে, দুঃখের বসতি,
কেহ কিছু ইহা জানে
তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

---

(২৩)

সুহই।

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥

অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।

গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥

পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়

তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥

কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥

সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত;
ভাল মন্দ নাহি জানি।

কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি॥

———

(২৪)

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে, শুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি-মুরতি পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিল॥
সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেন তারে, কলঙ্কিণী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কিনা, করে,
অবুধ মূঢ় সে লোকে!
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
পর চরচায় যেবা থাকে॥

— ——

(২৫)

পিলু ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

অন্তরযামী মেরা স্বামী, মেরা স্বামী তূহী হয়।
তুঝবীন কিসসে ম্যঁয় দিলকো লগাউঁ,
তেরে সিওয়া কিস্‌কে দর জাউঁ,
তুঝকো হী জীবন-লক্ষ্য বনাউঁ, মেরা স্বামী তূহী হয়।
তুঝবীন অওর নেহী কোই
মেরা দূর করে জো দিলকো অন্ধেয়া ;
ম্যঁয় তেরা, আওর তু প্রভু মেরা, মেরা স্বামী তূহী হয়।
তূ দাতা ম্যঁয় তেরা ভিখারী,
তূ পুজনায় ম্যঁয় তেরা পূজারী।
তুঝমে হী মেরী আশা সারি মেরা স্বামী তূহী হয়।
তুঝসে জুঁহী দিলকো লগায়া
হরসূ তেরা জলোয়া নজর আয়া ;
তুঝকো হী ম্যঁয়নে আপনা পায়া, মেরা স্বামী তূহী হয়॥

---

(২৬)

কামোদ।

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈসে রয়।
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায় ॥
কহে দ্বীজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

---

(২৭)

মাঝি এবার তোমার আপন হাতে বেয়ে চল দাঁড়।
তোমার হাতে কাণ্ডারী গো দিলাম সকল ভার ॥
এখন, ইচ্ছা তোমার ফেল ধর দুঃখ দেখে আদর কর,
আমি শুধু চাইব তোমার চরণ পারবার।
বহিব তোমার দণ্ড সুধা ঝরুক অশ্রুধার ॥
কুলের কথা ভুল্‌লো যে মণ ভাস্‌লো অকুলে,
এবার তুমি বাহ গো তরী হালটী নাও তুলে।
তোমার স্নেহ পিযুষ ধারায়, সিক্ত কর রিক্ত আমায়,
না হয়, কেড়ে নিয়ে সকল বালাই মার বারম্বার
জানবো এই তোমারি পারের কড়ি নিলে কর্ণধার ॥

---

(২৮)

সুহই

শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন ॥
শ্যাম সে গলায় হার ॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম সাড়ি পড়ি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হ'ল রাধা ॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চ স্বর
বঁধূয়া পেয়েছি কোলে।
হরিয়া মাঝারে, রাখিহ শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥

———

(২৯)

এমন সুধামাখা হরিনাম নিমাই
কোথা হতে এনেছে।

এ নাম একবার শুনে হৃদয় বীণে
আপনি বেজে উঠেছে ॥

কতবার এ নাম শুনেছে শ্রবণ
কখন ত প্রাণ করেনি এমন।
(আজ) কি জানি কি নব ভাবের উদয়
(আমার) হৃদয় মাঝারে হ'তেছে ॥

কেটে গেছে বিষম নয়নেরি ঘোর
গ'লেছে কঠিন পরাণ মোর।
(তাই) কি যেন কি এক উজ্জ্বল জগতে
(আমায়) ভাসায়ে লয়ে চলেছে ॥

আজ হ'তে নিমাইয়ের সঙ্গ না ছাড়িব
জ্ঞানের গরব কভু না করিব।
(তাই) সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি ব'লে
নাচিতে বাসনা হ'তেছে ॥

কে যেন আমায় বল্‌ছে কাণে কাণে
(ও তোর) পারের উপায় হ'লো এত দিনে ;
প্রেমেরি পশরা লয়ে নিজ শিরে
প্রেমেরি ঠাকুর আজ এসেছে ॥

———

(৩০)

বরাড়ী।

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়লি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী যে জন মিলে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

---

(৩১)

কে আমি কেমনে বুঝিবে, নির্গুণে গুণহীনা আমি সগুণ সাকারে
আমি বেদমাতা, বিশ্ববিনির্ম্মিতা ওম আমি ব্যাপ্ত চরাচরে॥
প্রভাতে কুমারী, মধ্যাহ্নে যুবতী, সায়ংকালে ধরি প্রবীণা মুরতি
অচ্যুতা অক্ষয়, অনাদি অব্যয়, বটপত্রে ছিলাম কারণ পাথারে॥

রজগুণে ধরি স্বয়ম্ভূ মুরতি, তমোগুণে মম বিষ্ণুলোকে স্থিতি,
সত্ত্বগুণে আমি সাজি পশুপতি, সৃষ্টি স্থিতি লয় ত্রিবিধ আকারে
দেবতা মানবে আমায় সমভাবে, ইষ্টদেবী কি ইষ্টদেব ভাবে
মম ইষ্টধন সেইত সম্ভবে, ভক্তি ভাবে ভবে যে ভাবে আমারে
কুণ্ডলীনী আমি থাকি চতুর্দ্দলে, হংসরূপে আমি সাজি পদ্মনালে,
যে ভাবে ভুবনে যে ভাবে আমারে, সেইভাবে আমি দেখাদি তারে ॥

---

(৩২)

রাগিণী—ভীমপলশ্রী—তাল একতালা।

আমি নইরে দূরে, রয়েছি অন্তরে, বারেক চাহিয়া দেখনা।
তুমি দূর বোধে থেকে, (জীব রে), ডাকিছ আমাকে, আমি যে
ডাকিতা শুন না।
হৃদয়েতে রই কভু ছাড়া নই, ছাড়িলেও আমি ছাড়ি না।
আমি অহরহঃ নিশি, (জীব রে) কত মতে তুষি, এতেও কি
মনে হয় না ॥
আমারি কোলেতে ; আছ অনুক্ষণ, আমি করি দুঃখ সান্ত্বনা।
তুমি দেখিয়ে না দেখ, (জীব রে) বৃথা কেন ডাক, দেখার
বাকি কি রেখেছি বল না ॥
এত দেখা দেখি, তবু বল দেখি, একবার আঁখি মেলনা।
আমি কি আর বলিব, (জীব রে) কেমনে বুঝাব, দেখা
আঁখি না মেলিলে হবে না ॥

---

(৩৩)

যার মুখে ভাই হরি কথা নাই
তার কাছে তুমি যেওনা
যারে হেরি তুমি পাশরিবে হরি
তার মুখপানে চেও না ॥

কদিন রহিবে ভব মাঝে আর
কর অবিলম্বে যা কিছু করিবার।
লোকেরি কথায় কিবা আসে যায়
মিছে দাগা তুমি পেও না ॥

কে তোমারে ভবে কি কবে বলিবে
সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে।
লাজে ভয়ে শুধু কুণ্ঠিত হৃদয়ে
কুপথ ধরিয়ে যেও না ॥

একাকী এসেছ, একাকী যেতেছ, আপন করম স্রোতে,
দুদিনেরি খেলা, দুদিনেরি মেলা, অনন্ত জীবন পথে,
(ও ভাই) বিপদে সম্পদে যে রাখিবে পদে
তাঁর পদ কেন ভাব না ॥

হরি কথা কও, হরি গুণ গাও,
হরি প্রেম রসে মত্ত হয়ে রও,
হরি গুণ গীতি নিতি নিতি গাও,
অন্য গীতি ভাই গেও না ॥

---

(৩৪)

নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি,
নিতাই বিহনে মোর নাহি অন্য গতি।
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব,
নিতাই-বৈমুখী জনার মুখ না হেরিব।
গঙ্গা যার পদজল হরশিরে ধরে,
হেন নিতাই না ভজিয়া (জীব) দুঃখ পাইয়া মরে।
সংসার সুখের মুখে তুলে দিয়ে ছাই,
নগরে মাগিয়া খাব গাহিয়া নিতাই।
"লোচন" বলে আমার নিতাই প্রেমকল্পতরু,
পতিতপাবন নিতাই জগতের গুরু ॥

(৩৫)

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি তোমার পায়ের সাড়া পাই।
আঁখি মেলে চাইতে গেলে আর তো তুমি নাই ॥
তোমার ঐ বাঁশীর তানে
গান জাগায় আমার প্রাণে
সে গান কি যায় তোমার কাণে তাই তোমায় শুধাই ॥
তোমার পায়ে নূপুর বাজে
শুন্‌তে পাই তা প্রাণের মাঝে
থাক' তুমি এত কাছে
তবু কেন খুঁজে বেড়াই ॥

(৩৬)

কানন খুঁজিয়ে রাঙ্গা জবাফুল এনেছি যতনে তুলিয়ে।
বারেক এস' মা রাঙ্গা পাদুখানি সাজাব মানস ভরিয়ে॥
হীরক, স্ফটিক, রজত, কাঞ্চনে
কোথা পাব' মাগো দিব শ্রীচরণে।
বনফুল সার কিছু নাহি আর লও মা অধম বলিয়ে॥
সে সুখ সম্পদ গেছে ত সকলি,
দিনে দিনে ক্ষীণ শোণিতাশ্রু ঢালি,
শক্তির সাধনা সুদূর বাসনা, আছি মা জীবনে মরিয়ে॥
বিপদের ত্রাস সদা হা হুতাশ
পদে পদে মাগো আশাতে নৈরাশ
প্রাণের বেদনা কেহ ত বুঝে না, দেখনা করুণা করিয়ে॥

---

(৩৭)

এখন নেভেনি হোমেরি আগুন
আসিছে ধূপেরি গন্ধ।
খোল' খোল' ওগো মন্দির দ্বার
(কেন) এখনি করিলে বন্ধ॥

পাষাণ দেবতা পূজিব বলিয়া
বহুদূর হ'তে এসেছি চলিয়া,
যেওনা যেওনা চরণে দলিয়া,
কপাল আমার মন্দ॥

অভাগার প্রাণে কামনা অপার
ভয় নাই প্রভু চাহিব না আর,
শুধু শুধাইব কি দোষ আমার
ঘুচে যাবে দ্বিধা দ্বন্দ ॥

———

(৩৮)

বুকে ব্যথা না পেলে কি
সুখে তারে পাওয়া যায়।
(ওরে) দুখে না পড়িলে পরে
সুখে কি কেউ ডাকে তায় ॥

তাই দুখ ভাল সুখের চেয়ে,
ঘুমন্তে দেয় ঘুম ভাঙ্গিয়ে,
সুখের নেশায় মাতাল হ'য়ে
সুপথে কেউ যায় না হায় ॥

ডাকার মত ডাকলে পরে,
আর কিরে সে থাকতে পারে।
সে যে ছুটে এসে কোলে করে,
আঁখির জল সব মুছিয়ে দেয় ॥

———

(৩৯)

৺ মাতার গঙ্গালাভ সময়ে নীম্নলিখিত গানখানি
মাতার প্রার্থনানুসারে পিতা বলরাম বোস্ ঘাটে গাহিয়া ছিলেন।

আমার অন্তিম সময়, হরি দয়াময় একবার শ্রীরাধা লইয়া বামে হে
চূড়া ধড়া পড়ি দাঁড়াও হরি ললিত ত্রিভঙ্গঠামে হে।
(একবার দেখা দিও—আমায় ভুল না নাথ)
(ওহে পতিত পাবন ভুল না হে—ওহে রাধাবল্লভ)
কিবা মকর মুণ্ডল কানে, যে ভুষা যেখানে, চতুর্দ্দিকে ব্রজবালা হে
(রবে চতুর্দ্দিকে ব্রজবালা শুধু, একলা নও নাথ চতুর্দ্দিকে ব্রজবালা)
কিবা দ্বিভুজ মুরলী, ধরি বনমালী, কণ্ঠে পরা বনমালা হে
(রবে কণ্ঠে পরা বনমালা হে, ঐরূপে দেখা দিও)
কিবা অলকা আবৃত ও মুখ মাধুরী নিরখিয়ে যেন মরি হে
(যেন ভুল না নাথ—ঐ রূপে দেখা দিও)
রাঙ্গা চরণ দুখানি দেখিতে দেখিতে আঁখি যেন মুদিত করি হে
(যেন ভুলি না নাথ—যেন মনে থাকে— রাধাকৃষ্ণ
নাম বলতে পারিহে সেই অন্তিম সময়)

———

(৪০)

আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে
চলনা আপন মন্দিরে।
তুমি যা'র তত্ত্ব কর অবিরত,
সে যে আজ্ঞাচক্রে বিহরে॥

বামে ঈড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা,
রজঃ তম গুণে করিতেছে খেলা,
মধ্য শতদলে সুষুম্না বিমলা
ধর ধর তা'রে সাধরে ॥
(মন চল না আপন মন্দিরে)
কুলকুণ্ডলিনী ত্রিবলী আকারে
চির নিদ্রাগত আছে মূলাধারে,
গুরুদত্ত তত্ত্ব সাধনার জোরে
জাগ্রত কর না তাহারে ॥
নাদবিন্দু ভেদী চল সুষুম্নারে
নিরবধি যথা 'প্রণব' ঝঙ্কারে।
(তুমি) গোবিন্দ আনন্দে সদা হেরে
আসিতে হবে না সংসারে ॥

---

(৪১)

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

জয় কালী—জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে পাগল হ'লো
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল ॥

---

(৪২)

কামোদ।

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন
গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্দর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল
কুল-কামিনী-কান্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল
কুঞ্জ-মন্দিরে শান্ত॥
গণ্ড-মণ্ডল বলিত-কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত
বাহু দণ্ডিত দণ্ড॥
কুঞ্জ লোচন কলুষ মোচন
শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কমল চরণ কিশলয়
নিলয় গোবিন্দ দাস॥

---

(৪৩)

সিন্ধুড়া।

অঞ্জন-গঞ্জন জগজন রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ-জিনি-বরণা।
তরুণারুণথল- কমলদলারুণ
মঞ্জীররঞ্জিত চরণা॥

দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে।
শুধই সুধারস হাস বিকাশিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥
ইন্দিবর বর গরব বিলোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।
ভাঙভুজগ-পাশে বান্ধল কুলবতী
কুলদেবতী মন কান্দে ॥
ভ্রমর করম্বিত জানু অবলম্বিত
কেলিকদম্বক মাল।
গোবিন্দদাসচিতে নিতি নিতি বিহর
ঐছন মুরতি রসাল ॥

---

(৪৪)

আর কতদূরে আছ' প্রভু প্রেম পারাবার
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার।
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে
ভকতি প্রবাহ ম্লান ক্ষীণ জলধর ॥
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
অচল হইয়া প্রভু পড়ে বারবার।
নিরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাব পার ॥
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে
একবিন্দু বারি দিব চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা,
করুণা কল্লোলে তা'রে ডাক একবার ॥

---

(৪৫)

(তুমি) নির্ম্মল মম, সুন্দর তুমি
হৃদয় জুড়ানো সখা।
(বসে) আছি তব আশে— আকুল পিয়াসে
কত যুগ ধরি একা॥
নির্ম্মল আকাশে, প্রকাশে তব
হেম কিরণ মালা।
(আজি) সব জগত চকিত বিস্মিত
হেরি মধুর তব লীলা॥
জনম মরণ আশে ছুটিয়া কাঁদিয়া
(তব) চরণ পরে লুটিয়া।
একি আনন্দ গগনে চন্দ্র কিরণে
হাসিছে কিবা তারকা॥
ফুল পল্লব তরু শাখে
কত বিহগ বিহগী ডাকে।
তারা যাচে তারা নাচে
হেরিতে তব ঐ নয়ন বাঁকা॥
(কে তুমি) অপূর্ব্ব বঁধুয়া— মন মোহিয়া
বাজাইছ বাঁশি।
দিবানিশি হৃদয়ে একা
হৃদি যমুনা কো তীরে॥
বাঁশরীর সুরে গাহিছ অধীরে
সঙ্গীত সুধামাখা॥

---

(৪৬)

বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন ।

ধানশী ।

তাতল সৈকতে   বারি বিন্দু সম
সুত-মিতরমণী-সমাজে ।
তোহে বিসরি মন   তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব, হাম পরিনাম নিরাশা ।
তুহুঁ জগত-তারণ   দীন দয়াময়
অতএব তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম   নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা ।
নিধুবনে রমণী   রস রঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা ॥
কত চতুরানন   মরি মরি যাওত
নতুয়া আদি অবসানা ।
তোহে জনমি পুন,   তোহে সমাওত
সাগরী লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি   শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা ।
আদি অনাদিক,   নাথ কাহায়সি,
অবতারণ ভার তোহারা ॥

---

(৪৭)

অযতনে মিলে কি সই, সাধনার ধন কাল রতন।
যতনে হৃদয়ে তারে রাখতে হয়গো প্রাণের মতন ॥

প্রেমিক বটে প্রেমিক পেলে,
প্রেম করে সে প্রাণটী খুলে,
কিন্তু অযতন হ'লে,
শিকলী কাটা পাখীর মতন ॥

প্রাণ দিয়ে তায় স্বার্থ ছেড়ে,
সদা রাখ হৃদ্ মাঝারে,
অন্য লোকে দেখলে পরে,
যে পাবে সে লবে তখন ॥

গোপনে প্রেম যে জন করে,
প্রেমিক বাঁধা তারই করে,
পাছে অভিমান ভরে,
হারায়োনা প্রাণেরি ধন ॥

অপূর্ব্বেন্দ্র এই বলে,
প্রেম কর সই আপন ভুলে,
সহজ ফাঁদে পড়বে ধরা,
অনায়াসে রসিক সুজন ॥

———

(৪৮)

বাউলের সুর—তাল আড়খেম্‌টা।

(কেমন) করুণ স্বরে ডাকচে ব'সে দুই ঘুঘু পাখী।
(ব'সে) বিজন বনে ও দুজনে করচে ডাকাডাকি,
(পাতার আড়াল হ'ে না দেখাদেখি)॥
ডেকে বলে এই যে ঘুঘু সই,
(এস) প্রাণসখা আমার কাছে দু'জনে এক হই,
কেন মিছে আর লুকিয়ে থেকে,
দিচ্চ হে আমায় ফাঁকি॥
(প্রাণসখা) ঘুঘু সখা দিচ্চেরে সাড়া,
(বল্‌চে) পার যদি এস ভেঙ্গে ঐ পাতার বেড়া,
(নইলে) এ জীবনে ঘটিবে না আমাদের দেখাদেখি॥
(প্রাণ সখি) শুনে তাদের প্রেমানন্দ কয়,
(যদি) মিলনের সাধ দু'জনেরি হয়েছে উদয়,
(তবে) পাতায় কি আর বেধে থাকে প্রেমেরি
তুফান সখি॥

———

(৪৯)

ঝিঁঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

আনন্দময়ী আমার মা যে হাসিছে।
ঐ যে মা হাসে, ছেলে হাসে, হাসির বাজার বসেছে (আনন্দপুরে),
মেঘের কোলে সূর্য্য শশী, দেখ্‌লে হাসে জগৎবাসী ;

তেমনি ব'সি, মায়ের আশে পাশে হাসিতেছে মুনি ঋষি,
যোগীগণ যোগে ব'সে, হাসি হাসি বলিতেছে; (একমেবাদ্বিতীয়ম্)
মায়ের মুখে হাসি দেখে, অ্যাকই হাসি সবার মুখে,
সুরাসুর নরলোকে, অ্যাকই হাসি হাসিতেছে।
মায়ের মুখে হাসি হেরে, কাঁঙ্গাল কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে
আনন্দ হাসির ঘরে, কেবল কাঙ্গাল কাঁদিতেছে।
(গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্ ব'লে)

---

(৫০)

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়, হবে মা তারিণী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার, সকলি অসার, হবে নৈরাকার জলে জলময়॥
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার, পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়॥
দিবা ভাগে রাত্র রাত্র ভাগে দিন, জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যবে হবে শক্তিহীন, দয়াময়ীর হবে পাষাণ হৃদয়॥
পবনের যেদিন গতি রোধ হবে, ভুজঙ্গেতে যেদিন গরুড়ে দংশিবে,
অপার সমুদ্র বিড়ালে লঙ্ঘিবে, পূর্ব্বে যে ভানু পশ্চিমে উদিবে,
ক্ষুদ্র জীব পঙ্গু সুমেরু লঙ্ঘিবে, সত্যবাদী যদি মিথ্যাবাদী হয়॥
চন্দ্রের যেদিন হবে অশিত বরণ, ব্রহ্মার যেদিন হবে অনলে মরণ
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন, যুধিষ্ঠিরের হবে পাপের আশ্রয়॥
ভূমিকম্প হবে কাশী তীর্থ ধামে, সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে,
যদি সুখী হই হব সেই দিনে; নতুবা সে আশা এজনমে নয়॥

---

(৫১)

গৌরী—একতালা।

হে ব্যথাদমন, শ্রীমধুসূদন
ভব ব্যথা হবে কবে হে লয়।
জীবে ব্যথা পায়, তুমি দয়াময়
কেমনে তা দেখ হইয়ে নিদয়॥
কোটী কল্প ধ'রে, যুগ যুগান্তরে,
পেয়ে আসে ব্যথা দেবাসুর নরে।
তোমারি সৃজিত, ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
কেবা বল হরি ব্যথা না সয়॥
(আর) ব্যথা ব'লে ব্যথা, বিলাপের গাথা
ধরা-বক্ষ ভেদি উঠে যথা তথা।
কি করুণ স্বর, টলেও ভূধর,
(কেবল) তোমারি আসন অটল রয়॥
তবুও তোমার নামটী 'দয়াল'
আছে হে বিদিত জীবে সর্ব্বকাল।
(তুমি) রাখ আর মার, তবুও কাঙাল,
"কাঙালের হরি" ব'লে গাবে জয়॥
তবে কেন হরি, ব্যথাহারী নামে,
কলঙ্ক রটাও সাধ করি জ্ঞানে।
আঁধারে ডুবাও অজ্ঞানে অধমে,
কোলে টেনে লও করুণাময়॥



(৫২)

জীবনে যে যত পেয়েছে দাগা—
তোমারি প্রিয় তত নহে অভাগা ॥

সংসার যাহারে অবহেলে,
নিয়ত রাখে দূরে পায়ে ঠেলে,
সার্থক তাহারি চির জীবন জাগা—
তোমারি প্রিয় সে যে নহে অভাগা ॥

ব্যথায় ভরেছে যার হিয়া
অপমান বিষে জর্জ্জরিয়া,
সার্থক তাহারি তব করুণা মাগা—
তোমারি প্রিয় সে যে নহে অভাগা ॥

নয়ন জলে করায়ে স্নান
ভাঙ্গিলে গর্ব্ব সকল মান,
জাগালে যাহারি প্রাণে অনুরাগা—
তোমারি প্রিয় সে যে নহে অভাগা ॥

তোমারি সুখ তোমারি শান্তি
তোমারি দুঃখ তোমারি শ্রান্তি
দিয়েছ যাহারে তুমি সমান ভাগা—
তোমারি প্রিয় সে যে নহে অভাগা ॥

———

শ্রীগুরুচরণে।

চিনিতে ক্ষমতা নাই ধারণার অতীত প্রভু
কে তুমি সুন্দর ?
গেহটী ভরিয়া গেছে অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তব
মনোমুগ্ধ-কর।
চির শান্তি বিজড়িত অমিয় মধুর নাম
উঠে "সীতারাম"
অনন্ত আনন্দ গীতি অনন্ত আনন্দ ধারা
বহে অবিরাম।
শান্তির ত্রিদিব চারু চন্দন চর্চ্চিত ঐ
প্রশান্ত ললাট
প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ অধর কমল দল
অন্তর বিরাট।
নাহি আঁখি দেখিবারে তোমার অরূপ রূপ
অদৃশ্য দেবতা
তবু তুমি এস প্রভু আনন্দ পশরা ল'য়ে
এমন মমতা।
অদৃশ্য দেবতা মোর দেখাও দেখাও মোরে
সে অরূপ রূপ
আদিহীন, অন্তহীন, ভুবন গগন ব্যাপী
তোমার স্বরূপ।
নয়ন ভরিয়া আজি হৃদয় ভরিয়া ওগো
দাঁড়াও সম্মুখে।

শান্তরূপে, রুদ্ররূপে, ক্ষুদ্ররূপে, শান্তিরূপে
এস মোর বুকে
এস আজি ভগবান্ গভীর বেদনা মাঝে
এস প্রেমময়।
অমৃত ধারায় তব হৃদয় ভরিয়া যাক
যাক ভবভয়।
লিখিতে ক্ষমতা নাই, ভাষা নাই, বিদ্যা নাই
ক্ষমিও আমায়
ভীত কম্পিত বক্ষে শ্রীচরণে নিবেদিনু,
ওগো দয়াময়।

তোমার সভার মাঝে কত মহাগুণী আছে
শ্রীচরণ পূজিয়াছে কত পুষ্পভারে

আমি অতি, অতি দূরে ক্ষুদ্র দীন আছি পড়ে
কাতর করুণকণ্ঠে ডাকি বারে বারে।

শুধু নয়নের জল হয়েছে গো সম্বল
এ ছাড়া আর আমার কি আছে দিবার

নাহি জানি স্তব স্তুতি অজ্ঞান মূরখ অতি
(শুধু) তোমার চরণে কোটী প্রণাম আমার।

———

পরিশিষ্ট।

অজপার উপলব্ধি।

আমি আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী সন্তান, ও সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন এবং সেই কারণেই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শরণাগত জীব। আমার পক্ষে 'অজপা' বিষয়ে আমার নিজের কোনরূপ ভাব প্রকাশ করা আমার সাধনার অভাবে ও অজ্ঞানতার জন্য অসম্ভব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঠাকুরের স্থূল দেহে তাঁহার সদ্‌গুরু শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের সময় উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলীমধ্যস্থ আমার মত অধম জীবের উপর এই দুরূহ বিষয় কি বুঝিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিবার আদেশ হইয়াছিল। যে সময়ে এই আদেশ হয়, সে সময়ে আমার অবস্থা শোচনীয়। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমার প্রভুর অর্থাৎ শ্রীশ্রীঅপূর্ব্ব ঠাকুরের আদেশ মত অভ্যাস ও সাধনা তদ্রূপ হয় নাই, উপলব্ধিও তাহা অপেক্ষা কম, একেবারেই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে অবস্থায় শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকট 'অজপা সম্বন্ধে দুই চারিকথা বলা কি রূপ কঠিন, তাহা আমি সে সময় সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ভিতরে বুক গুর্ গুর করিতেছিল ও যথার্থই প্রায় সংজ্ঞাশূন্য-অবস্থা', শ্রীভগবানের আদেশ, প্রতিপালন না করিলে, শুধু অপরাধ নহে, আমার ঠাকুর শ্রীশ্রীঅপূর্ব্বঠাকুর আমাকে সে বিষয়ে এক বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষিত করিয়াছেন এই এক বৎসর যাবৎ কি করিলাম, কিছু না কিছু অন্ততঃ দুই চারি কথা বলিতে না পারিলে আমার ঠাকুর অপাত্রে অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন ভাল রকম সাব্যস্ত হইয়া যাইবে ও তাঁহার প্রতি ভীষণ অমর্য্যাদার কারণ হইবে, এই সাত পাঁচ ভাবিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া যৎসামান্য দুই এক কথা বলিয়াছিলাম। কি বলিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই, আমার বিশ্বাস সমস্তই বাজে কথাই বলিয়াছিলাম; কিন্তু শেষ হইবার পর শ্রীভগবান সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই টুকু মাত্র স্মরণ আছে।

পরে আমার ঠাকুর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কি কি কথা বলিয়াছিলাম, আমি উত্তরে বলি যে আমার কিছুই স্মরণ নাই। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম যে গত মহাভাবের সময়ে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর উক্তি সমুদয় সন্নিবেশিত পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাতে সে বিষয়ে অর্থাৎ 'অজপা' সম্বন্ধে কথোপকথন বা ভাবের অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিয়া পুনরায় আমার ঠাকুর শ্রীশ্রীঅপূর্ব্ব ঠাকুরের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া এই অজপা বিষয়ে দুই চারি কথা লিখিতে প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। আমি জানি ইহা ঐ পুস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইবে না তত্রাপি লিখিয়া দিলাম, আমার ঠাকুর যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন মহাভাবের পুস্তকে লেখাইয়া দিবেন, নচেৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন, তাঁহার শ্রীচরণে ইহাই আমার নিবেদন। পরে অজপা সম্বন্ধে অধমের এই স্ফুরণগুলি ঠাকুরের স্ফুরণের সহিত মুদ্রিত করিবার আদেশ হয়, ইহা, সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও সদ্‌গুরুর আদেশ মত "অজপা-কল্পতরু" পুস্তকের সহিত সন্নিবেশিত হইল তজ্জন্য "পাঠকবৃন্দ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

'অজপা' কাহাকে বলে :—

আমরা সচরাচর চলিত কথায় জপ অর্থে মালা জপ বুঝি ও জপ করিতে হইলে মালার সাহায্যে জপ করিয়া থাকি। অর্থাৎ মালাতে গুরুপ্রদত্ত "ইষ্টমন্ত্র" বা "বীজমন্ত্র" শ্রীভগবান বা ব্রহ্মময়ী মার 'মন্ত্র' উচ্চারণ করিয়া সংখ্যা রাখিয়া সাধনা করি। কিন্তু এই অজপা সাধনার জন্য মালার আবশ্যক হয় না ইহাতে মালার পরিবর্ত্তে শ্বাস প্রশ্বাসের আবশ্যক। অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যে এই জপ করিতে হয়। জপের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করা বা স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করা। সাধারণতঃ জপ নীরবে করা হয়। অর্থাৎ মনে মনে নাম উচ্চারণ করিয়া মালা ঘুরান হয়। এই শ্রীভগবানের নাম প্রতি "শ্বাস প্রশ্বাসের" সঙ্গে স্মরণ করাই স্থুলতঃ 'অজপা' সাধন।

সাধনা মাত্রেই স্তরে স্তরে করা কর্ত্তব্য ও আবশ্যক। প্রথম অবস্থায় শুধু এই "শ্বাস প্রশ্বাসের" উপর লক্ষ্য রাখিলেই যথেষ্ট। এই শ্বাস ও প্রশ্বাস জীব জন্মগ্রহণ করিলেই অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই সন্তানের শরীরের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে চলিতে আরম্ভ হয়। যতদিন জীব মাতৃ গর্ভে থাকে, ততদিন মাতৃ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তাহার

শ্বাস প্রশ্বাস সংশ্লিষ্ট জীব জীবন ধারণের জন্য এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করে। এই শ্বাস প্রশ্বাস অন্তিম কাল পর্য্যন্ত এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে। জীবের কর্ম্মশেষ হইলেই এই শ্বাস প্রশ্বাস' অর্থাৎ যাহাকে আমরা "প্রাণ বায়ু" বলি তাহা শরীর ছাড়িয়া অনন্ত বায়ুতে মিশাইয়া যায়। তাহাকেই আমরা মৃত্যু বলি। অর্থাৎ এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রীয়া বন্ধ হইলে আমাদের এই দেহ একটা জড় পদার্থে পরিণত হয় ও যে সমস্ত উপাদান হইতে উহা গঠিত সেই সমস্ত উপাদানে অর্থাৎ পঞ্চভূতে পুনরায় পরিণত হয়; সেই পরিণতি যাহাতে শীঘ্র হয় সেইজন্য আমরা মৃত্যুর পর জড়দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতের সহিত মিলন করাইয়া দিই। অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণবায়ু এই মনুষ্য দেহে অবস্থান করিয়া জন্ম কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় সমস্ত কার্য্যই করাইতেছে। এই শ্বাস প্রশ্বাস মৃত্যুর পর অনন্ত বায়ুতে মিশাইয়া যায়। ঈশ্বর অনন্ত, বায়ু অনন্ত। আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ দেখি নাই, কখনও জীবনে দেখিব বলিয়া আশাও নাই। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহাকে অসীম, অনন্ত, অগুণীয়, ভাবাতীত, ত্রিগুণ রহিত ইত্যাদি ভাবে ভাবনা করিতে হয়। তাঁহার সৃষ্ট সামগ্রীর মধ্যে অসীম কোন জিনিয দেখিলেই আমাদের তাঁহার কথা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের কথা স্মরণ হয় বা তাঁহার স্বরূপের ভাব মনোমধ্যে জাগরিত হয় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ আমরা দেখি নাই। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই কয়টি জিনিষ অসীম, অনাদি ও অনন্ত এবং বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই ও সণাতন শাস্ত্র ও বিজ্ঞান ইহা প্রমান করিয়াছেন যে এই পঞ্চ সামগ্রীর সমষ্টিই এই বিশ্ব সৃষ্টি'তে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুও সেই সঙ্গে জীব মাত্রেই পাঁচটি সামগ্রী হইতে ও পাঁচটি সামগ্রীর সাহায্যে নির্ম্মিত। কিছুদিনের জন্য এই পঞ্চ সামগ্রীর সমষ্টিভূত দেহ, কোন এক আকার বা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে, পরে আবার সেই আদি সনাতন পঞ্চ সামগ্রীতে পরিণত হয়। এই যে জীবের আকার বা মূর্ত্তি ধারণ ও কিছুদিন বাদে পুনরায় এই পঞ্চ সামগ্রী অর্থাৎ পঞ্চভূতে পরিণতি, ইহাকেই জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া সাধারণতঃ জানি। বস্তুতঃ জন্ম বা মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর বা রূপান্তর মাত্র। জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। অথচ আমরা দেখিতেছি জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে।

অতএব এই যে প্রাণবায়ু যাহা আমরা "শ্বাস প্রশ্বাস" দ্বারা অনুভব করি, এই প্রাণবায়ু আমাদের দেহে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সমস্ত কার্য্যই করাইতেছে ও সমস্ত সুখ দুঃখ অনুভব ও উপভোগ করাইতেছে। পুণ্য কার্য্যও করাইতেছে পাপ কার্য্যও করাইতেছে। জীবনের সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্তা এই "প্রাণবায়ু" বা "শ্বাস প্রশ্বাস"। ইহার সহিত "সঙ্গ" করার নামই "অজপা" সাধন করা। এই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎ কৃপা লাভ, ভগবদ্দর্শন ও তদ্বারা সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন ও মানব জন্মের সফলতা লাভ করা।

শ্রীভগবানের আবাস স্থান আমরা বলি বৈকুণ্ঠে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ কোথায় তাহা জানি না। দেখি নাই দেখিবও না। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন, স্থূল ভাবে আমরা উপলব্ধি করি যে তাঁহার নিকট হইতে এই বায়ুই আমাদের অর্থাৎ "জীবের" সহিত ব্যবধান স্থাপন করিয়াছে। আমরা বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করি এবং পুনরায় বায়ুতেই এই শ্বাস প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করি। এই অনন্ত বায়ুর মধ্য দিয়া এই প্রশ্বাস তাঁহার নিকট উপনীত হয় অর্থাৎ তাঁহার পদস্পর্শ করে। স্বভাবতঃ আমাদের প্রশ্বাস নাসিকার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া নাসিকা হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত যায় এ পর্য্যন্ত আমরা এই প্রশ্বাস উপলব্ধি করিতে পারি তৎপরে অনন্ত বায়ুতে মিশাইয়া যায়। কিন্তু এই শ্বাস প্রশ্বাসের প্রত্যেক ঘাত প্রতিঘাত প্রতিবার অনন্ত বায়ুর মধ্য দিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন। এ বিষয়ে ধারণা করা বিশেষ কঠিন নহে, কেননা এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে শব্দের ঘাত প্রতিঘাত হাজার হাজার মাইল বায়ু অতিক্রম করিয়া তারবিহীন যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতেছে। ইহাত হইল ধারণার কথা। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতেছি যে এই প্রাণবায়ু আকার ভেদে বা মূর্ত্তি ভেদে শ্রীভগবানের কর্ম্মও করিতেছে ও ঘোরতর পাপীর কর্ম্ম করিতেছে। যে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়া ইহলোকে আবির্ভূত হইয়া, জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারও দেহে এই একই "প্রাণবায়ু" বর্ত্তমান ছিল ও এই একই শ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে তাহার লীলা বা স্বকর্ম্ম সাধন করাইয়াছিল। এই একই অনন্ত বায়ুর মধ্য হইতে গৃহীত ও প্রত্যাহত একই শ্বাস প্রশ্বাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার বাল্যে লীলা খেলা খেলাইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মন্ত্রদাতা ও সারথীরূপে চালিত করিয়াছিল, এই একই শ্বাস প্রশ্বাস ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তবীরগণের দেহে আবিষ্ট ছিল। এই শ্বাস প্রশ্বাসই সেই

অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্যনীয় শ্রীভগবানের অংশ. এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই "অংশ"টুকু সাধনার দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া, বিশুদ্ধ হইয়া, পরিস্ফুট হইয়া ক্রমশঃ সেই অনাদি. অনন্ত, অখণ্ড শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়। এখন প্রশ্ন এই যে কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহা সম্ভব। ও কি উপায়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায়। আমার ঠাকুর বলিয়াছেন যে এই 'অজপা' সাধন করিলে শীঘ্রই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই ব্রহ্মসান্নিধ্যে উপনীত হওয়া যায় ও এমন কি ব্রহ্মত্ব অবধি লাভ করাও যায়। আমি তাঁহার অকৃতি, নিকৃষ্ট দীনহীন অযোগ্য সন্তান, যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি ততটুকু তাঁহার প্রসাদে ও তাঁহার কৃপায় এই সামান্য লিপিতে প্রকাশ করিবার প্রয়াস কবিব মাত্র। এই প্রয়াসের ফল সম্পূর্ণ তাঁহার হস্তে সমর্পিত।

আমরা দেখিতে পাই যে, জীব মাত্রেই যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাহার দেহে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু উহা অজ্ঞানতঃ চলে। জীব যাবতীয় কর্ম্ম করিবার সময়, নিত্যনৈমিত্তিক আহার, বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সর্ব্ববিধ কর্ম্ম কবিবার সময়, কোনও না কোন প্রকারে সে কর্ম্মের উপর একবারও লক্ষ্য স্থাপন করে, কিন্তু এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর কখনও লক্ষ্য স্থাপন করে না। সে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আপনার স্বধর্ম্মে অহোরাত্র স্বকর্ম্ম সাধন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে জীবের লক্ষ্য নাই, দৃষ্টি নাই। কিন্তু জীব জানেনা যে এই শ্বাস প্রশ্বাসই তাহার সর্ব্বস্ব, তাহার একমাত্র সম্বল, ইহকালের ও পরকালের, ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমানের, কালের অনন্তগতির মধ্য দিয়া এই শ্বাস প্রশ্বাসই একমাত্র সঙ্গী, সেই একটিমাত্র বিষয়ে তাহার লক্ষ্য নাই, এতদ্ব্যতীত সমস্ত বিষয়েই তাহার কিছু না, কিছু লক্ষ্য আছে। স্বভাবতঃ জীব শ্বাস প্রশ্বাসের উপর যতক্ষণ না ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করে ততক্ষণ কখনই লক্ষ্য করে না। জননী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবামাত্র, জননী দেহ হইতে সন্তান দেহ বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র এই শ্বাস প্রশ্বাস উঠিতে ও পড়িতে থাকে। কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেছে, দেহী জীবের সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। অর্থাৎ অন্তরে যে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব রহিয়াছে সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই। যতদিন পর্য্যন্ত সদ্‌গুরু সেই বিষয়ে লক্ষ্য করিতে উপদেশ না দেন, ততদিন পর্য্যন্ত দেহীজীব ভগবৎ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও স্থূলতঃ জাগরিত থাকিলেও

সম্পূর্ণ নিদ্রিত। যে মুহূর্ত্তে সদ্‌গুরু এই শ্বাস প্রশ্বাসের অস্তিত্ব ও তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দিলেন, সেই মুহূর্ত্তে জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখার নামই "অজপা সাধন"।

আমরা সকলে দেখি যে "যোগাভ্যাসের দ্বারা" বা "প্রাণায়াম দ্বারা" সাধু সন্ন্যাসী মুনী ঋষিগণ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে পৌছিয়া থাকেন ও সেই ক্রিয়ার দ্বারা সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার সঙ্গসুখে অপার আনন্দ উপভোগ করেন। নিশ্চই আনন্দ উপভোগ করেন নচেৎ সব ত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনা করেন কেন? অন্ততঃ সেই আশায় পার্থিব সমস্ত সুখ বর্জ্জন করিয়া যোগ সাধনা করেন।

প্রাণায়াম অর্থে আমরা সাধারণতঃ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া ভিতরে মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সমাধিস্থ হইবার প্রয়াস বা অভ্যাস করা ইহাই বুঝি। ইহার অপর নাম "হঠযোগ"। ইহাতে তিনটি ক্রিয়া আছে, রেচক, পূরক ও কুম্ভক। এই কুম্ভক অবস্থাতে সমাধি হয়। কিন্তু তাহা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত সম্ভব হইলেও দুরূহ ও সংসারী জীবের পক্ষে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ সদ্‌গুরুর রীতিমত শিক্ষা ব্যতীত ইহা করিতে গেলেই, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ হইতে হয়।

কিন্তু এই "অজপা" সাধনে সে সমস্ত ভীতির কারণ একেবারেই নাই। ইহাতে রেচক পূরক আছে কিন্তু তাহা সহজ ভাবে, ও কুম্ভকের অবস্থা কিছু দিন অভ্যাসের পর পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ইহা অতি সহজ। সেই জন্য ইহার নাম "সহজ প্রাণায়াম"। জীব ভূমিষ্ট হইলে "শ্বাস প্রশ্বাস" আরম্ভ হয় সেজন্যও ইহার নাম "সহজ প্রাণায়াম" কেন না ইহা জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হয়।

কেবলমাত্র শ্বাস আমাদের শরীরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি ও তাহা "প্রশ্বাস" দ্বারা বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছি এই ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখিলেই "অজপার প্রাথমিক" সাধন সিদ্ধ হইবে। এই লক্ষ্যই হইল অজপার আসল জিনিষ। অহঃরহ এই লক্ষ্য করা অভ্যাস করিতে হইবে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে জীব ২১,৬০০ শত বার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বভাবতঃ করে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে সময়টুকু আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য করিতে পারিব বা দৃষ্টি রাখিতে পারিব, সেই সময়টুকুই আমরা, সহজ ভাবে, বিনা আসনে বিনা পূজোপচারে,

বিনা মুক্তিতে সেই শ্রীভগবানের বা ব্রহ্মময়ী মার সহিত সঙ্গ করিব। এইটুকু মনে রাখিয়া "অজপা" সাধন করা উচিৎ

শ্বাস প্রশ্বাস আপনি চলিতেছে, তাহাতে প্রয়াস করিতে হয় না, কেবলমাত্র আবশ্যক সে বিষয়ে লক্ষ্য করা। সেই লক্ষ্য করিতে হইলে সেইদিকে মন দিতে হয়। সমস্তই মনের কার্য্য। মন না প্রয়োগ করিলে কোন কার্য্যই হয় না। আবশ্যক কেবল এই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করা।

শাস্ত্রে বলে "মানব জন্ম" জীবের শ্রেষ্ঠ জন্ম। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে জীব মানব জন্ম লাভ করে। এই মানব জন্ম দুর্লভ জন্ম। জীবের মধ্যে পশু, পক্ষী, খেচর, জলচর, ও ভূচর তদ্ব্যতীত কীট পতঙ্গ আদি করিয়া কত জীবের অস্তিত্ব আছে তাহা কতক আবিষ্কৃত হইয়াছে ও কতক এখন ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এই জীবের মধ্যে পশু পক্ষী ও অন্যান্য জীব ও মানুষে প্রভেদ এই যে "মানুষ" যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে সক্ষম, অন্যান্য জীব তাহাতে অক্ষম। এই কর্ম্ম মধ্যে "জগতের মঙ্গল" সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। এ কার্য্য ভগবৎ শক্তি ও সাধনা ব্যতীত কখনও সম্ভব নহে।

জীব মাত্রেই কর্ম্মফল জড়িত। রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করিলেই, সেই কর্ম্মফলের কবল হইতে নিষ্কৃতি নাই। সেই কর্ম্মফলেই মনুষ্য এত দুঃখ, তাপ, শোক, ব্যাধি, জরা, ঋণ প্রভৃতি অশান্তিজনক শত্রুর কবলে পতিত হয়। সুতরাং জীব মাত্রেই এই জীবন ব্যাপী অশান্তি যুক্ত। এ অশান্তি কোনও না কোন আকারে জীব মাত্রকেই গ্রাস করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কি উপায়ে এই অশান্তির কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বা অপরকে রক্ষা করা যায়? মুনি, ঋষিগণ, সাধু সন্ন্যাসীগণ জগতের মঙ্গল দিবারাত্রি করিতেছেন। আমরা সাধু বা সন্ন্যাসী নই বলিয়া কি সে মহৎ কার্য্য একেবারেই করিতে পারি না? অবশ্যই পারি। সম্যক্ ভাবে না পারি কিয়ৎ পরিমাণে করিতে পারিলেই জীবন ধন্য হইয়া যায়। জগতের মঙ্গল অনেক প্রকারে করা যায়। দিবারাত্রি আমরা প্রত্যেকে সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর প্রদত্ত শান্তিপ্রদ মাঙ্গলিক সহানুভূতি বা সাহায্য বা কৃপা কোনও না কোন রূপে পাইতেছি। নচেৎ ইহলোকে জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য। দরিদ্র নারায়ণ দাতার হস্তে ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন; ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের নিকট ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া ব্যধি মুক্ত হইতেছেন; শোকী

তাপী সদ্গুরুর নিকট হইতে শান্তি বারি প্রাপ্ত হইয়া শোক তাপ ভুলিতেছেন। মঙ্গল-ময়ের কৃপা সদাই আমাদের উপর বর্ষণ হইতেছে; নচেৎ জীবন ধারণ অসম্ভব। স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন প্রভৃতি গৃহস্বামীর নিকট হইতে রক্ষণা-বেক্ষণ, বাস-স্থান, ভরণ-পোষণ পাইতেছেন, সকলেই এই ভাবে জীবন ধারণ ও যাপন করিতেছেন। সুতরাং সেই পরমপিতা পরমেশ্বর কর্তৃক মনুষ্যাকারে পৃথীবিতে প্রেরিত হইয়া যদি স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয়স্বজন ছাড়া পাড়া প্রতিবেশী দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি ব্যথিতক্লিষ্ট জীবের অর্থাৎ জগতের মঙ্গল আমাদের প্রত্যেকের সাধ্যানুরূপ না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে মানব জীবনই বৃথা।

এই অজপার দ্বারা জীব শুধু নিজের কেন সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারে। এই অজপার সাহায্যে জীব নিজের শান্তির উপায় নিজে করিতে পারে. কি প্রকারে পারে তাহা পরে বলা হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই যে যাহাকে আমরা পাপ বলি, সেই পাপ, কেবল আমাদের মনোবৃত্তির বাহ্যিক বিকাশ বা ক্রিয়া। তাহা মানবের চিরশত্রু ষড় বিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টী রিপুর বশীভূত ক্রিয়া কলাপ। এই ষড়রিপু মানবচিত্তকে সর্ব্বদাই বিপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে বা মনকে স্বায়ত্তাধীনে আনিতে হইবে। মন এক, দুই নহে। সুতরাং সেই মনকে যদি সর্ব্বদা—অন্ততঃ স্মরণ হইলেই—এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর নিবিষ্ট রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে এই "অজপা"ই চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে আমাদিগকে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করিবে।

এখন দেখাযাউক এই শ্বাস প্রশ্বাস মানব দেহের মধ্যে থাকিয়া কি প্রণালীতে "অজপা" সাধনার পথে স্বক্রীয়া সাধন করিয়া যাইতেছে। আমাদের দেহের পৃষ্ঠ ভাগে যে মেরুদণ্ড আছে তাহার নিম্নে মূলাধার নামীয় একটি স্থান আছে। শাস্ত্রমতে ও আমাদের গুরুদেব বলিয়াছেন যে অজপার ধ্বনি বা স্রোত বা শক্তি এই শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে "মূলাধার" হইতে "আজ্ঞাচক্র" পর্য্যন্ত উঠিতেছে ও নামিতেছে।

এই মূলাধার শক্তির স্থান, সেই স্থানে কুণ্ডলিণী শক্তি দ্বিমুখ বিশিষ্ট সর্পাকারে নিদ্রিতাবস্থায় আছেন। আর আমাদের ভ্রুযুগলের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে

দেব দেবীর মূর্ত্তিতে আমরা তৃতীয় চক্ষু অঙ্কিত দেখিতে পাই, সেই স্থানের নাম আজ্ঞাচক্র। সেই স্থান প্রণবের স্থান। ধ্যান করিবার সময় দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনকে এই আজ্ঞাচক্রের উপর স্থাপিত করিয়া দেব, দেবী বা গুরু ইষ্ট প্রভৃতি মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে আমরা প্রথমে কল্পনায় পরে সাধনায় উন্নতি লাভ করিলে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিতে পারি।

স্বাভাবিক শ্বাস আমরা যখন অনন্ত বায়ু হইতে আমাদের শরীরের মধ্যে গ্রহণ করি, তখন তাহাকে পূরক বলা হয়। আর যখন তাহা আবার অনন্ত বায়ুতে ত্যাগ করি, তখন তাহাকে রেচক বলা হয়।

"অজপা" প্রথম অবস্থায় অভ্যাস করিতে হইলে এই মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠিতেছে ও নামিতেছে ইহা উপলব্ধি করিতে গেলে শ্বাস প্রশ্বাসের উপর জোর দিবার প্রয়াস পাইতে হয়; কিন্তু তাহা নিষিদ্ধ। প্রথমাবস্থায় কেবল মাত্র অনন্ত বায়ুর মধ্য হইতে আমরা শ্বাস গ্রহণ করিতেছি ও পুনরায় অনন্ত বায়ুতেই উহা ত্যাগ করিতেছি, এই শ্বাসের ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। একটু অভ্যাস হইলেই, আমাদের উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে "অজপা" "মূলাধার" হইতে "আজ্ঞাচক্র" পর্য্যন্ত উঠিতেছে ও পড়িতেছে অর্থাৎ প্রতি শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অজপা মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠিতেছে ও প্রতি প্রশ্বাসের সঙ্গে আজ্ঞাচক্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত নামিতেছে। এইরূপে আবার উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। এই ভাবে জীব যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অজপা ক্রিয়া হইতেছে।

এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য অভ্যাস করিতে করিতেই সাধকের মনঃস্থির করিবার প্রথম উদ্যম সফল হইবে। কেন না কোন বিষয়ে লক্ষ্য-করিতে হইলেই সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্য অভ্যাস হইলেই বুঝিতে হইবে যে সে বিষয়ে মনঃস্থির একটু অভ্যাস হইয়াছে॥

তৎপরে সাধক লক্ষ্য করিবেন যে এই শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাভিস্থল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাভিস্থলের চারিধারের মাংসপেশীর স্পন্দন হইতেছে অর্থাৎ প্রতি শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে নাভিস্থল উঠিতেছে ও প্রতি প্রশ্বাসের সঙ্গে নাভিস্থল নামিতেছে।

আমরা এই অনন্ত বায়ুমধ্য হইতে যে শ্বাসরূপ বায়ু নাসিকার মধ্য দিয়া গ্রহণ করি তাহা আমাদের শরীরের মধ্যস্থিত ফুস্‌ফুস্‌ (Lungs) অবধি গিয়া তৎপরে প্রশ্বাসরূপে আবার অনন্ত বায়ুতেই কণ্ঠনালী ও নাসিকার মধ্য দিয়া প্রক্ষিপ্ত হয়। ইহা হইল অজপার বহিরঙ্গ ক্রিয়া মাত্র। "অজপা" কিন্তু শরীর মধ্যে "মূলাধার" হইতে "আজ্ঞাচক্র" পর্য্যন্ত ফোয়ারার জলের মত উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সে উঠা নামা ক্রিয়া প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে চলিতেছে, উহা অন্তর্মুখী ক্রিয়া তাহাতে লক্ষ্য করিতে হইলেই মনকে অন্তর্মুখী করিয়া ঐ উঠা নামার উপর নির্দ্দিষ্ট বা স্থাপিত করিতে হইবে। এই মানবদেহে প্রাণবায়ু যতদিন থাকিবে ততদিন এই অজপার ক্রিয়া চলিবে, এ উঠা নামা থামিবে না। জীব ইহার উপর লক্ষ্য স্থাপন করুক বা না করুক এ অজপা ক্রিয়া স্বভাবতঃ চলিতেছে ও চলিবে।

যখন শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে নাভিস্থল উঠা নামার উপর লক্ষ্য অভ্যাস হইবে, তখন উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে যে এই অজপা, এই নাভিস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নস্থিত মূলাধার হইতে স্থূলতঃ আমাদের উদরের মধ্য দিয়া হৃদয়ের মধ্য দিয়া কণ্ঠনালীর পথ ধরিয়া আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত প্রতি শ্বাস গ্রহণের সহিত উঠিতেছে ও প্রতি প্রশ্বাসের সহিত ঐ পথ ধরিয়া আজ্ঞাচক্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত নামিতেছে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত "অজপার" এই উঠা নামা ক্রিয়া নাভিস্থল হইতে পূর্ব্বকথিত স্পন্দনের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী এ অজপা ক্রিয়া সাধক বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সাধক এ অবস্থায় পৌঁছাইলে, শ্বাস প্রশ্বাসের উপর অর্থাৎ অজপার বহিরঙ্গের ক্রিয়ার উপর হইতে অন্তর্মুখী ক্রিয়ার উপর তাঁহার মন আপনা আপনিই নিবিষ্ট হইয়া যাইবে।

শাস্ত্র মতে এই অজপা ক্রিয়া 'হংসঃ' এই ধ্বনির সহিত উঠিতেছে ও নামিতেছে অর্থাৎ হং এই মন্ত্র বা শব্দের সহিত উঠিতেছে ও সঃ এই শব্দ বা মন্ত্রের সহিত নামিতেছে। সাধক আসন করিয়া বসিলে, এই অজপাক্রিয়া কোন পথাবলম্বন করিয়া উঠিতেছে ও নামিতেছে এই চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইবে, যে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের পথ দিয়া হংসের

গ্রীবার মত আকার ধারণ করিয়া কিংবা সর্প ফণা তুলিয়া উঠিলে যে আকার ধারণ করে সেই আকার ধারণ করে সেই আকার ধরিয়া অজপা ক্রিয়া উঠা নামা করিতেছে।

অজপার বহিরঙ্গের ক্রিয়ার সাধনা কালে এই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া অজপার "উত্থান পতন" ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে গেলে, উপলব্ধি সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। বহিরঙ্গ ক্রিয়া অভ্যস্ত হইলে পর; ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন সামগ্রীর উপলব্ধির বিষয় অভ্যাস করিতে হইবে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া সুষুম্নার স্থান ও দুই পার্শ্বে ঈড়া পিঙ্গলার স্থান। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ এই সুষুম্নার মধ্য দিয়া চালিত হয়। রজঃ এবং তমঃ এই দুই ভাবের কর্ত্তৃত্ব হইতে সত্ত্ব গুণের আয়ত্তে "মন"কে আনয়ন করিতে পারিলে মনোবৃত্তি এই সুষুম্নার ভিতর দিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত "অজপার" সাথী হইয়া উঠানামা ক্রিয়াতে নিযুক্ত হইবে। ক্রমশঃ সেই মন উঠানামা করিতে করিতে আজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া যাইবে, ও সেই অবস্থাতে সাধকের সমাধি অবস্থা প্রাপ্তি হইবে।

পুরুষ প্রকৃতির মিলন :—

এই বিশ্বজগতে পুরুষ প্রকৃতির মিলন সর্ব্বত্র বিদ্যমান। পুরুষ প্রকৃতির সহিত ও প্রকৃতি পুরুষের সহিত মিলনেচ্ছায় ধাবিত। সৃষ্ট সমুদয় জীব "প্রকৃতি", সৃষ্টি কর্ত্তা পরমেশ্বর "পুরুষ"। প্রকৃতি চাহেন পুরুষের সহিত মিলন। অর্থাৎ জীব চাহেন সৃষ্টি কর্ত্তার সহিত সঙ্গ। ইহাই জীবের স্বধর্ম্ম। দুঃখের বিষয়ে এই যে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ও সেই পরমেশ্বরকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া জীব বৃথা অনিত্য বিষয়ে সময় এমন কি সারা জীবন নষ্ট করে।

এই অজপার দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলন বা সঙ্গ লাভ করিতে পারে। এত বড় কঠিন কার্য্য যে এত সহজ উপায়ে সাধিত হইতে পারে, ইহা প্রত্যেক মানবেরই জানা আবশ্যক।

এই শ্বাস অজপার সহিত মিলিত হইয়া মূলাধার অর্থাৎ মাতৃ বা শক্তির স্থান বা কুণ্ডলিনী হইতে উঠিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রণবের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত বায়ুতে মিলিত হয়। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে এইরূপ প্রকৃতি পুরুষের মিলন

হইতেছে। আবশ্যক কেবল তাহার লক্ষ্য, তাহার উপলব্ধি ও তজ্জনিত আনন্দোপভোগ, সর্ব্বশেষে শ্রীভগবানের স্বরূপ দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করা। এই আজ্ঞাচক্রেই ধ্যান, ধারণা করিতে আমাদের ঠাকুর শিক্ষা দিয়াছেন। মূলাধারেও ধ্যান হইতে পারে, কিন্তু ঠাকুর শিখাইয়াছেন যে আজ্ঞাচক্রে ধ্যান ধারনাই প্রশস্ত। কেহ কেহ হৃদয়েও ধ্যান ধারনা করেন। মূলাধারে ধ্যান ধারণা করিতে হইলে শ্বাস উঠিবার সময় গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন ও পড়িবার সময় প্রসারণ করা হয়, কিন্তু তাহাতে আমার মনে হয় অযথা কামের উদ্দীপনা হয়। আমার প্রভুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এই গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়ার নাম "অশ্বিনীমুদ্রা"। অজপা সাধনার প্রথমাবস্থায় ইহার আবশ্যকতা নাই।

সাধক অজপা লক্ষ্য করিতে বেশ সুচারুরূপে অভ্যাস্থ হইলে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত এই অজপা আমাদের শরীর মধ্যস্থ মূলাধার হইতে উঠিয়া আজ্ঞাচক্র অবধি উঠিতেছে ও পুনরায় মূলাধারে নামিতেছে ও শ্বাস অনন্ত বায়ু হইতে গৃহীত হইতেছে ও প্রশ্বাস অনন্ত বায়ু মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। অজপার প্রধানতঃ লক্ষ্য আবশ্যক যে "অজপা" করিতে গিয়া বা সাধনা করিতে গিয়া কোনরূপে শ্বাস প্রশ্বাসের উপর জোর না পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক ভাবে উঠিতেছে ও পড়িতেছে, সেই ভাবে উঠিতে পড়িতে দেওয়া উচিৎ। জোর দেওয়া নিষিদ্ধ। ইহা অভ্যাস করা অতি সহজ, শ্বাস প্রশ্বাসের উপর কেবল মাত্র লক্ষ্য স্থাপন করাই আবশ্যক ; শ্বাস প্রশ্বাস যে স্থান হইতে উঠিয়া, যে পথে নিজগতি চালিত করিয়া, যে পথে বাহিরে যাইতেছে, শুধু সেই গমনাগমনের উপর লক্ষ্য বা দৃষ্টি রাখিলেই প্রথমে যথেষ্ট।

তৎপরে কর্ত্তব্য (১) যে মুহূর্ত্তে শ্বাস গ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ মূলাধার হইতে অজপা ক্রিয়া হইতেছে সেই মুহূর্ত্তে শক্তি মন্ত্র উচ্চারণ করা, যথা হ্রীং, এবং (২) যে মুহূর্ত্তে ঐ শ্বাসের সহিত অজপা আজ্ঞাচক্রে পৌছিতেছে, সেই মুহূর্ত্তে প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করা যথা হৌং। শ্বাস প্রতিবার নাসিকার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রশ্বাস রূপে অনন্ত বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে তাহার স্বাভাবিক গতি রোধ করা অকর্ত্তব্য। এইরূপে প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শক্তি ও প্রণব মাত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অজপার দ্বিতীয় স্তরে সাধক উঠিতে পারেন।

মন্ত্রঃ—হ্রীং—হৌং

হং———সঃ

সীতা———রাম

রাধা———কৃষ্ণ ইত্যাদি—

এইরূপে মন্ত্র সংযোগে অজপা অভ্যাস ভাল রকম হইলে, পরে চেষ্টা করা উচিত যাহাতে সেই অভ্যাস অধিক্ষণ স্থায়ী হয়। অজপার "শক্তি" এত অধিক ও জপ হিসাবে মূল্য এত অধিক যে যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এক ঘণ্টা অজপা ধরিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে মালায় জপের দশগুণ ক্রিয়া সঞ্চিত হয়। অজপায় একবার শ্বাস প্রশ্বাসের মালায় দশবার জপের সমান ফল। হয়ত একাধিক্রমে আমরা একঘণ্টা কাল অজপা ধরিয়া থাকিতে সময় পাইতে না পারি, সে জন্য অজপা যতটুকু ধরিতে পারি, তাহাই চেষ্টা করা উচিৎ। যখনই স্মরণ হইবে তখনই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর দৃষ্টি (লক্ষ্য) করিবে। যখনই মন নিষ্ক্রিয় বা অলস ভাবে থাকিবে এবং বৃথা চিন্তা মনে উদয় হইবে, তখনই অজপার কথা স্মরণ করিয়া অজপা ধরিতে পারি, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত মন আপনা আপনই অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট হয় বা সরিয়া যায়। মন সরিয়া গেলেই আমরা অজপা ছাড়িয়া দিব, ইহা স্বাভাবিক। আবার মনে পড়িলেই অজপা ধরিতে হইবে; এইরূপে ২।৪।৫।৬ মিনিট দিন রাত্রির মধ্যে হয়তো ১০।১৫ বার বা ২০ বার আমরা অজপা ধরিতে অভ্যস্থ হইব। এই অভ্যাস যতই করিব ততই বাড়িয়া যাইবে, অভ্যাসের নিয়মই এইরূপ। ক্রমশঃ এমন অবস্থা আসিবে যে এই অজপা অহোরাত্র চলিবে। খাইতে, শুইতে, বসিয়া থাকিতে, কথা কহিতে কহিতে, আফিসের কাজ করিতে করিতে, ক্রমশঃ নিদ্রিতাবস্থাতেও এই অজপা চলিবে। তখন পূর্ণমাত্রায় অজপা চলিবে।

ইহাত গেল অজপা অভ্যাসের কথা। অভ্যাস যাহা করা যাইবে, তাহাই অভ্যাস হইবে। এখন দেখা যাউক এই "অজপা" অভ্যাসের বা সাধনার উদ্দেশ্য কি? জীব মাত্রেই আনন্দের পথে, আনন্দের দিকে ধাবমান। ইহা চিরন্তন সত্য। ইহা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমরা মানুষ, আমরা তো ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। জগতে সমস্ত জীবই---পশু, পক্ষী, মানুষ সেই আনন্দের পথে ধাবমান।

মানুষ এই আনন্দের পথে ধাবমান হইয়া, যাহাতে আনন্দ পাইবে, সেই কার্য্য করিতে গিয়া পশ্চাতে দেখে যে তাহাতে কোন আনন্দ নাই। মহামায়া ব্রহ্মময়ী মা "বিদ্যা" ও "অবিদ্যা" দুই-ই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই "অবিদ্যাই" বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে "মায়া"র খেলা খেলেন ও "বিদ্যা" মায়ামুগ্ধ জীবকে মার চরণে পৌঁছাইয়া দেন। জগতে চিরন্তন সুখ কিছুতেই নাই। আছে কেবলমাত্র তাঁহার সান্নিধ্যে। পোষাক পরিচ্ছদে সুখ নাই, পয়সা উপার্জ্জনে সুখ নাই, স্ত্রীসম্ভোগে সুখ নাই, জগতে যত কিছু সামগ্রী মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে সুখের জন্য, কোন সামগ্রীতেই চিরন্তন সুখ নাই। এ সমস্ত সুখে ব্রীড়া আছে, সুখের পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত আছে, পশ্চাতে দেখিতে পাই। যাহা সুখপ্রদ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, যাহাতে যাহাতে সুখ পাইব বলিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাতে আসল খাঁটি সুখ নাই। আসল সুখ, শান্তি আনন্দ কেবলমাত্র ভগবৎ প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তনে ও তাঁহার সহিত মিলনে। এই অজপায় সর্ব্বতোভাবে জীব তাঁহার সঙ্গ সুখ ভোগ করিতে পারে। সেইজন্যই এই অজপার আর একটি নাম "সৎসঙ্গ"। এই অজপা অহরহঃ অভ্যাস হইলে তাঁহার সহিত অহরহঃ সঙ্গ করার ফল হয়। আবার "সৎ" অর্থে "সদা বিদ্যমান" বুঝায়, সঙ্গ অর্থে মিলনাভিলাষে সান্নিধ্য লাভ বুঝায়। এই শ্বাসই ব্রহ্ম, ইহা বোধ হয় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং অজপার "সঙ্গ" করিলে সৎসঙ্গ করা হয়।

এইরূপ অহরহঃ "অজপা" অভ্যাস করিতে করিতে সেই "অজপা" মন্ত্রসংযোগে সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়। যখন গুরু দেখেন যে "অজপা" সুচারুরূপে অভ্যাস হইয়াছে তখন মন্ত্র চৈতন্য করাইয়া দেন। গুরু সে বিষয়ে একমাত্র বিচারক, তিনি যখন শিষ্যের সাধনা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন তখন মন্ত্রচৈতন্য করাইয়া দেন। মন্ত্রচৈতন্য হইলে এই অজপাতে আনন্দ উপলব্ধি হয়। ক্রমশঃ আনন্দ উপলব্ধি হইতে হইতে দর্শন লাভ ও দর্শনের পরে সাধকের মিলনাবস্থা প্রাপ্তি হইলে সাধক সমাধিস্থ হন।

এই অজপার সাহায্যে জগতের এমন কার্য্য নাই যাহা সম্পাদন করা যায় না। সংকল্প করিয়া সমস্ত কার্য্যই করা যায়। মনসংযোগে অজপা সাধন করিতে করিতে যখন গুরু-কৃপায় মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়, তখন সাধকের অসাধারণ শক্তিলাভ হয়। শক্তিলাভ হইলে

সেই শক্তির চালনায় সাধক সর্ব্বপ্রকার জগতের মঙ্গলময় কার্য্য সমাধা করিতে পারেন। যথা, সাধক যদি ইচ্ছা করেন যে হরিদ্বারে এক ব্যক্তি পীড়িত তাহার ব্যাধির শান্তি করিবেন—তাহা হইলে অগ্রে গুরুপ্রণাম করিয়া ও তাঁহার নিকট শক্তিভিক্ষা করিয়া তৎপরে পীড়িত ব্যক্তির নাম গোত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র সংযোগ করিয়া "অজপায়" সেই পীড়া শান্তির জন্য ক্রিয়া করিতে পারেন। ইচ্ছামত বা আবশ্যকমত বা গুরুর আদেশ মত এইরূপে অজপায় সেই পীড়ার শান্তি অবশ্যম্ভাবী, কেননা মন্ত্র সংযোগে সাধকের সেই শ্বাস প্রশ্বাস মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া হরিদ্বারে পীড়িত ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া তাহার ব্যাধিগ্রস্থ শরীরের উপর শান্তিবারি বর্ষণ করে, ইহা সত্য ও আমার বিশ্বাস। তবে এরূপ কঠিন কার্য্যে গুরুর সাহায্য আবশ্যক ও কৃপা আবশ্যক ও মন্ত্রচৈতন্য আবশ্যক। কেন না মন্ত্রচৈতন্য না হইলে মন্ত্রের কার্য্যকারিণী শক্তি জন্মায় না। তারবিহীন যন্ত্রে যেমন সংবাদ পাঠান সম্ভব, অজপায় এইরূপ ক্রিয়াও সম্ভব। এইরূপে এই অজপায় জগতের যাবতীয় মাঙ্গলিক ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে।

এই ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে এখনও কত যোগী, কত ঋষি, শত শত বৎসর যাবৎ সমাধিস্থ থাকিয়া এই অজপার সাহায্যে অহোরাত্র জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

আমরা রামকুটীরের "কাঙ্গাল সন্তান"। নিস্পৃহভাবে জগতের মঙ্গল সাধন করা আমাদের ঐকান্তিক বাসনা। নিঃস্বার্থভাবে ক্রিয়াই আমাদের জীবনের ব্রত। আমাদের ক্রিয়ার দক্ষিণা একটি হরিতকী মাত্র। আমাদের গুরুর আদেশ ও শিক্ষা, নিষ্কামভাবে প্রেমের উপর, জগতে মঙ্গল সাধন। সে সাধনে এমন কি গৌরবেচ্ছার লেশমাত্রও থাকিবে না। আত্মশ্লাঘা আসিলেই সব কার্য্য পণ্ড হইবে। সম্পূর্ণ স্বার্থ শূন্য না হইতে পারিলে জগতের মঙ্গল দুঃসাধ্য। শাস্ত্রে কথিত আছে বিনা দক্ষিনায় কোন ক্রিয়া হয় না, সেইজন্যই "একটি হরিতকী" দক্ষিণার অবশ্যকতা। নচেৎ তাহারও আবশ্যক নাই।

সংসারী জীব আমরা, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই বিব্রত, সর্ব্বদাই বিপন্ন গুরুদর্শনে সর্ব্ব বিপদ দুরীভূত হয়, মন শান্ত হয়, আতঙ্ক দুরীভূত হয়, কিন্তু সর্ব্বসময়ে গুরু দর্শন কাহার ভাগ্যে সম্ভবে? সেই অজপার শ্বাস প্রশ্বাস আমার গুরুপাদ প্রান্তে

পড়ুক, এই সংকল্পে বিপদের সময়, আমার অন্তরের সমস্ত ভয়, সমস্ত ব্যথা, সমস্ত ভাবনা সেই গুরুদেবের পদ প্রান্তে অঞ্জলি স্বরূপ প্রদান করিতে পারি ও তদ্দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারি ও মন শান্ত করিতে পারি ও হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারি। আমাদের সদ্‌গুরু যে সদাই বিপদোদ্ধারের জন্য, দুঃখ বিমোচনের জন্য দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিজ্ঞান বলেন যে এই শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের শরীরের অস্থি, মজ্জা, শোণিত প্রভৃতি সমস্ত উপাদানের সার বস্তু গ্রহণ করিয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে ও সেই প্রণালীতে চালিত হইয়া জীবকে জীবিত রাখিতেছে। সুতরাং এই শ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যে যদি আমরা পূজা করি অর্থাৎ সাধারণ কথায় আমরা "অজপা" সাধনা করি তাহা হইলে আমরা নিজের শরীরের শোণিতের সাহায্যে পূজা করিতে সমর্থ হইতে পারি। নিজ শরীরের শোণিতের দ্বারা পূজা অপেক্ষা জীবের পক্ষে উচ্চতর পূজা আর কি সম্ভবে? সুতরাং "অজপা" সর্ব্ববিধ পূজা মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূজা। এ পূজার বিশেষত্ব ইহাতে কালাকাল নাই, অহরহঃ চলিতে পারে, ইহাতে পুষ্প, বিল্বদল, গঙ্গাজল আবশ্যক নাই, ইহা বিনা উপচারে সাধিত হয়; ইহাতে জাতি ভেদ নাই, শাস্ত্রীয় পূজার অধিকার অনধিকার চিন্তার আবশ্যকতা নাই, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্রী স্বয়ং মা ব্রহ্মময়ী জীব মাত্রকেই এই শ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত করিয়া ধরাধামে পাঠাইয়াছেন, সুতরাং সকলেই এই পূজার সমান অধিকারী।

আবশ্যকতা কেবলমাত্র সদ্‌গুরু কর্তৃক এই "অজপা" রূপ সুধাপানে দীক্ষালাভ ও সদ্‌গুরুর আদেশ মত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইহার সাধনা ও তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ইহাতে আনন্দ লাভ, ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী মার সহিত অহরহঃ সঙ্গ লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন। তাহা হইলেই মানবের জন্ম সার্থক।—সবই গুরুর কৃপাধীন, সেই জন্যই বলি

"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্"

আর দুই চারি কথা বলিয়া "অজপা" সম্বন্ধে আমার এই ক্ষুদ্র শিক্ষাবিবরণী শেষ করিব। এই "অজপাই" বিশ্বসংসারে ভগবৎ শক্তিরূপে লীলা খেলা করিতেছেন। এই "অজপা" একেবারে শেষ হইলেই জীবের ভবলীলা সাঙ্গ। জন্মবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই

ভগবৎ শক্তি জীব দেহের মধ্যে থাকিয়া যত কিছু কর্ম্ম, যত কিছু চিন্তা, যত কিছু শান্তি, ও অশান্তির মধ্য দিয়া অহরহঃ নিজ ক্রিয়া সমাধা করিয়া চলিতেছে। সাধারণ জীব জানে না কখন এই "অজপা" শেষ হইবে। এই মূহূর্ত্তে যে এই শ্বাস উঠিল, কে বলিতে পারে যে উঠিয়া পড়িবার সময় এ জন্মের মত এই শ্বাস শেষ পড়িবে কি না। শেষবার পড়িলেই ত মৃত্যু হইবে, সুতরাং এই শ্বাস প্রতিবার উঠিবার সময় ও পড়িবার সময় জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া চলিতেছে। অনন্ত বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ কালে জীব অনন্ত বায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ও পড়িবার সময় অনন্ত বায়ু মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। যদি পুনরায় এই শ্বাস জীব না গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলেই ত "মৃত্যু"। মৃত্যুর পর জীব ত আর শ্বাস গ্রহণ করে না। এ জন্মের মত সেই শ্বাস অনন্ত বায়ুতে মিশাইয়া যায়। আর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা জড়পদার্থ, একটা অস্থি, মজ্জা, মাংসপিণ্ড মাত্র। সেই জড়দেহ কালে ধূলিতে পরিণত হয় ও পঞ্চ ভূতের দেহ পঞ্চ ভূতে মিশাইয়া যায়। এই যে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে জন্ম ও মৃত্যু তাহা ব্রহ্মময়ীর কৃপাধীন, তিনি কৃপা না করিলে জীব একবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া ও ত্যাগ করিয়া তৎপরে পুনরায় আর গ্রহণ করিতে পারে না। জীবিতাবস্থা হইতে মৃতাবস্থার এই শ্বাস প্রশ্বাসই (যাহা কেবল মাত্র এই অনন্ত বায়ুর অংশ মাত্র) একমাত্র পার্থক্য জনক চিহ্ন। যতক্ষণ এই শ্বাস প্রশ্বাস জীবদেহে অবস্থান করে ততক্ষণ জীব জানিতে পারে যে সে এই বিশ্বসংসারে জীবিত আছে। জীব দেহ হইতে এই শ্বাস প্রশ্বাস অন্তর্হিত হইলেই কেবল মাত্র দেহ পড়িয়া থাকে। এই শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের প্রাণবায়ু। ইহারই মধ্যে মানবের "আমিত্ব" নিহিত আছে।

এখন দেখা যাউক এই আমিত্বের উপর জীবের অধিকার কতটুকু। যখন এই শ্বাস ক্রিয়া কোন মূহূর্ত্তে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই ও যখন সেই শ্বাস প্রশ্বাস এ দেহে অবস্থিতি সম্পূর্ণরূপে মা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা ও কৃপা সাপেক্ষ তখন এই "আমিত্বের" উপর জীবের অধিকার কতটুকু তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এই শ্বাস প্রশ্বাস মা ব্রহ্মময়ীর শ্বাস প্রশ্বাস, এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট।

এ জগতে যদি জীবের নিজস্ব বলিয়া কোন জিনিষ থাকে, ত তাহা তাহার নিজের দেহ, এবং শ্বাস প্রশ্বাসই সেই দেহের সার পদার্থ এবং সেই দেহ তাহার নিজস্ব ততক্ষণ

যতক্ষণ সেই দেহে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, যে মুহূর্ত্তে তাহা দেহ ছাড়িয়া স্বস্থানে চলিয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তে সেই দেহ নিজায়ত্ত হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। সেই দেহের সৎকার হইতে পারে কিংবা তাহা শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্যও হইতে পারে বা কৃমি কীটের ভক্ষ্যও হইতে পারে। সুতরাং জীব দেহে প্রবাহিত এই শ্বাস প্রশ্বাস যে মা ব্রহ্মময়ীর দেওয়া শ্বাস প্রশ্বাস ইহা উপলব্ধি হইলেই জীবের "আত্মসমর্পণ" করা হয়। তাহার অর্থ এই যে "হে ব্রহ্মময়ী মা, আমার বলিয়া এ জগতে কোন পদার্থই নাই, এদেহে যতক্ষণ তোমার দেওয়া শ্বাস প্রশ্বাস আছে, ততক্ষণ এই দেহটী আমার ইহা আমরা বলিয়া থাকি ও অহঙ্কার করি, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে, তোমার দেওয়া শ্বাস প্রশ্বাস তুমি টানিয়া লইবে আমার এই দেহ একটা জড়পদার্থে পরিণত হইবে"। যখন এই সত্যজ্ঞান বা ধারণা জীবের উপলব্ধি হইবে, সেই মুহূর্ত্তে জীব পূর্ণমাত্রায় মা ব্রহ্মময়ীর চরণ প্রান্তে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইবে।

এই আত্মসমর্পণ মা ব্রহ্মময়ীর চরণ প্রান্তে আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখার অভ্যাসের দ্বারা করিতে পারিব। এই অভ্যাসকেই তাঁহার চরণ প্রান্তে পৌঁছিবার একমাত্র সহজ উপায় বলিয়া আমাদের জানা উচিৎ, এবং যে মুহূর্ত্তে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে এই দেহের কথা দূরে থাকুক, এই আমিত্বের পরিচায়ক শ্বাস প্রশ্বাস টুকুও মা ব্রহ্মময়ীর শ্বাস প্রশ্বাস সে মুহূর্ত্তে আমাদের বৈরাগ্যের উদয় হইবে।

জগতের মধ্যে আমরা যে সমস্ত সামগ্রীকে আমার বলিয়া থাকি বা অহঙ্কার করি, সে সমস্ত সামগ্রীর নশ্বরতা যখন উপলব্ধি হইবে, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হইবে। বৈরাগ্য আসিবে তখন, যখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে এ শ্বাস প্রশ্বাস টুকুও আমার নহে। বাড়ী, ঘর, টাকা, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গ ত দূরের কথা, এদেহের শ্বাস প্রশ্বাসের উপরও আমাদের কোন অধিকার নাই।

আবার অন্যদিকে মায়ার আধিপত্যের মধ্য দিয়া, অথচ মায়ার বশীভূত না হইয়া, জগতের সমস্ত ভোগ নির্লিপ্তভাবে সম্ভোগ করিয়া তাহার নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মময়ী মায়েরই প্রদত্ত এই সুখ বা দুঃখ ইহা অনুভব করিতে করিতে এই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করিতে করিতে মাতৃসান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেই এই জীবই "সোঽহং" অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। একদিকে নশ্বর জড়দেহাভ্যন্তরস্থিত অহমিকা

বশীভূত হইয়া জীব বার বার এ বিশ্ব সংসারে যাতায়াতের পথ প্রশস্ত করে ও অন্যদিকে এই "শ্বাস প্রশ্বাস" মা ব্রহ্মময়ীর শ্বাস প্রশ্বাস এই সত্য অবলম্বন করিয়াও জ্ঞানতঃ তাঁহার সঙ্গ করিয়া, তাহার উপর অহরহঃ লক্ষ্য রাখিতে অভ্যাস করিয়া জীব স্বরূপ দর্শন ও ভগবদ্দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মময়ী মা আমাদের মহামায়ারূপে সগুণ হইয়া বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া এই মায়ার খেলাই করিতেছেন, তিনি অহরহঃ দেখিতেছেন যে তাঁহার সৃষ্ট জীব, এই মায়ার মধ্যে অবস্থান করিয়া নিজের আসল সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে কিনা। এই আসল সত্তা উপলব্ধিই ব্রহ্মজ্ঞান। সেই জ্ঞান, এই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করিলে, গুরু কৃপায় অতি সত্বর লাভ হইতে পারে ও জীব কর্ম্মফলের নিষ্ঠুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌছাইতে পারে।

শেষ কথা, এখন আমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছি যে এই "অজপা"র লক্ষ্য করিতে করিতে আমরা মা ব্রহ্মময়ীর সান্নিধ্যে পৌছাইতে পারি। মা ব্রহ্মময়ী চৈতন্য স্বরূপিনী শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার স্বরূপ আমি দেখি নাই, গুরু কৃপা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ দর্শনের আশাও নাই।

অজপার উপর লক্ষ্য অভ্যাস করিতে করিতে যখন অহরহঃ অভ্যাস সাধকের করায়ত্ত হইবে, তখনই কোন না কোন সময়ে সাধক পূর্ণমাত্রায় তন্ময় হইলেই সমাধিস্থ হইবেন। বাহ্যজ্ঞান থাকিতে তাঁহার স্বরূপ দর্শন সম্ভবে না। পূর্ণমাত্রায় তন্ময় হইলেই সাধক বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হইবেন। যতক্ষণ সাধকের বাহ্যজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তিনি মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত। সাধনা করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলে অর্থাৎ অজপায় পূর্ণমাত্রায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে মায়ার আবরণ আপনা আপনি সরিয়া যাইবে ও চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী মার নিকট সাধক উপস্থিত হইবেন। সে অবস্থায় সাধকের পূর্ণানন্দ, সে আনন্দ অনির্ব্বচনীয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বা বর্ণনা করা যায় না। যিনি সে আনন্দ একবার মুহূর্ত্তের জন্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কখনও জীবনে ভুলিবেন না, ও তাহা উপভোগের নিমিত্ত তাঁহার পুনঃ পুনঃ বাসনা হইবে। অজপা সাধনা করিলেই তাহা করায়ত্ত হইবে।

কিন্তু ইহা অতীব সত্যকথা যে চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন ভগবদ্দর্শন বা ভগবচ্চরণে উপস্থিত হইবার বাসনা করা আর বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বাসনা করা সমান কথা। প্রত্যেক

সাধনার পথে এই চঞ্চল মনই সর্ব্ব রকমে প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই সাধনার পথ এত কঠিন। মায়াধীন জীব সর্ব্বদাই মহামায়া-সৃষ্ট মায়ার নিত্য-সহচর ষড়রিপুর অধীনে অবস্থান করিতেছে। এই ষড়রিপুই জীবের মন বা চিৎ শক্তিকে সর্ব্বদা নিজের করায়ত্তের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহা মায়ার খেলা মাত্র, ইহা উপলব্ধি হইবার পর, সাধকের চেষ্টা করা উচিৎ ষড়রিপুকে নিজের করায়ত্ত করা বা দমন করা। তাহা না হইলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ মন নিষ্কলঙ্ক হইলে, সাধনার পথ সুপ্রশস্ত। তাহার পরে বিশুদ্ধ প্রেমের স্ফুরণ, বিশুদ্ধ প্রেম অর্থে "অহেতুকী প্রেম," যে প্রেম সর্ব্ববিধ কামনা শূন্য। সেই প্রেমই যথার্থ ভগবৎ প্রেম, সেই প্রেম না হইলে ভগবদ্দর্শন লাভ হয় না।

অতএব: অজপা সাধনা করিতে করিতে আপনা আপনি চিত্তশুদ্ধি, অহেতুকী প্রেমের স্ফুরণ, পূর্ণ আত্মানন্দ লাভ, ও অবশেষে ভগবদ্দর্শন পরে পরে সবই সাধকের করায়ত্ত হয়। ইহাই "শান্তি"। ইহা পাইলে জীব যতই কর্ম্মফলের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়ুক না কেন, কিছুতেই অশান্তির করকবলে পতিত হইবে না। ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা।

এই চৈতন্যস্বরূপিণী মা ব্রহ্মময়ীর সঙ্গই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই এই চিৎশক্তির সমন্বিত শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গ করিতে করিতে মা ব্রহ্মময়ীর সঙ্গ করা যায় এবং সেই জন্যই তাঁহার সাধনা পথে "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র একমাত্র সহায়।

"ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম"—এই মন্ত্রের অর্থ চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপিণী শক্তিই একমাত্র ব্রহ্ম। সৎ-চিৎ = সচ্চিৎ, এস্থলে সৎ অর্থে সদা বিদ্যমানা, সদা বিদ্যমানা এই চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপিণী শক্তি সমন্বিত আমাদের মধ্যে অজপা বা প্রাণবায়ু ইহাই একমাত্র উপলব্ধির বস্তু। অন্য দিকে সৎ অর্থে শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ ইহাও বুঝা যাইতে পারে. বিশুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপিণী শক্তি অর্থাৎ নিষ্পাপ বা পবিত্র চৈতন্যস্বরূপিণী শক্তিই একমাত্র ব্রহ্ম ইহাও এই মন্ত্রের অর্থ হইতে পারে। কেননা ব্রহ্মশক্তি পাপ শূন্য, তাঁহার নিকট পাপের ছায়াও পৌঁছাইতে পারে না।

সামাজিকতার জন্য ও "আচার" নিবদ্ধতার জন্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত মূর্ত্তি পূজায় অধিকার কাহারও নাই, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ যাঁহার হইয়াছে একমাত্র তিনিই ব্রহ্ম পূজার অধিকারী, কেন না, ব্রহ্ম কি তাহা যিনি সম্যক উপলব্ধি না করিতে পারিয়াছেন তিনি

তাঁহার পূজা কিরূপে করিবেন। বাস্তবিক বিচার করিতে গেলে জাতিভেদ না করিয়া যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনিই তাঁহার পূজার অধিকারী। বিশ্বস্রষ্টার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি কোন জাতি ভেদই নাই, তাঁহার নিকট সবই সমান, তাঁহার চক্ষে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা বিশিষ্ট যজ্ঞোপবীতধারী অপেক্ষা বিশুদ্ধ চিত্ত চণ্ডাল অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহার নিকট বিচার অতি সূক্ষ্ম। মনুষ্যমাত্রেই এই শ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট হইয়া জননী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; এই শ্বাস প্রশ্বাসই যখন ভগবৎ প্রেম লাভ করিবার, তাঁহার সান্নিধ্যে পৌছিবার ও তাঁহার দর্শন লাভের একমাত্র উপায়, তখন বিচারে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এই শ্বাস প্রশ্বাসের পথ ধরিয়া ব্রহ্ম সাধনা করিবার অধিকার মনুষ্যমাত্রেরই আছে; যদি না থাকিত, ব্রহ্মময়ী মা জাতিভেদ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রকেই এই শ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট করিয়া ধরাতলে পাঠাইতেন না। মাতার নিকট বা পিতার নিকট সব সন্তানই সমান পিতা মাতা ইচ্ছা করেন না যে এক সন্তান তাঁহাদের ভালবাসুক ও অন্য সন্তান তাঁহাদের অপ্রিয় হউক। তবে কালে ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার জাতিগত ব্রহ্মজ্ঞানজনিত বিশিষ্টতার জন্য। সমাজ রক্ষার জন্য সর্ব্বজাতির সমান আবশ্যকতা। পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য সমাজে ব্রাহ্মণের আবশ্যক, শত্রুহস্ত হইতে দেশরক্ষায় জন্য ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক, কৃষিকার্য্যের জন্য বৈশ্যের আবশ্যক ও অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যের জন্য শূদ্রের আবশ্যক। কিন্তু সকলেই ব্রহ্মময়ী মায়ের সন্তান। এই অজপায় ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিতে পারেন।

পৌত্তলিকতা সনাতন বা অকৃত্রিম বৈদিক ব্রহ্মসাধনা নয়। সনাতন হিন্দু ব্রহ্মসাধনা নিরাকার ব্রহ্মসাধনা, তবে মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া যথাবিধি আচারে মন্ত্র সংযোগদ্বারা তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাই যথার্থ পূজা। মূর্ত্তি পূজা সাধকের সেই মানসপূজায় সহায়তা করে মাত্র ও অশিক্ষিত অগণিত নরনারীর যাহাদের মানসপূজা করিবার শক্তি বা জ্ঞান নাই তাহাদের চক্ষে সজীব রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দ প্রদান করে ও মনোভীষ্ট সাধন করে। সুতরাং এই অজপা সাধনা মানসপূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং এই অজপা বা শ্বাস প্রশ্বাস জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবদেহে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতি রেচকপূরকে মানব হৃদয়ের সারাংশ চিৎ বা মন বা চৈতন্যশক্তির

সহিত মিলিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গুরুর নিকট দীক্ষা, শিক্ষা ব্যতীত, তাঁহার কৃপা ব্যতীত সে মিলন ঘটিবার নহে। এ ভারতে এমন একদিন ছিল যখন জীবের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর সহিত দীক্ষা নিত্য সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন আমরা সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাববিহীন, দীক্ষা জিনিষটা একটা হাসি, বিদ্রূপ, উপহাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বরং তাহা অপেক্ষা আরও অধিক তাচ্ছিল্যের বস্তু হইয়াছে, অনেক স্থলে ধর্ম্মভাব ক্ষিপ্ত, বা উন্মাদ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু ফলে মানব জীবন একটা চির হাহাকার, পূর্ণ অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

আমরা স্বীকার করি বা না করি ইহা অতীব সত্যকথা যে জীব মাত্রেই শান্তির পথে ধাবমান। যাহা কিছু কর্ম্ম এজগতে আমরা করি, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, যে তাহাতে ফলে সুখ বা শান্তি লাভ হইবে। আহার, বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, ধন উপার্জ্জন এ সমস্তই সুখ বা শান্তিলাভের প্রত্যাশায় জীব নিত্যনৈমিত্তিকভাবে সাধন করে। কিন্তু কিছুদিন বাদে, স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে তাহাতে চিরন্তন সুখ বা শান্তি নাই। শান্তির অভাবকেই আমরা অশান্তি বলি, বাসনা পরিতৃপ্ত না হইলেই অশান্তি। বাসনা "অহমিকার" মায়া প্রসূত চির সহচর। মায়ার স্বধর্ম্ম মিথ্যা বা নশ্বর সামগ্রীতে আস্থা বা আশক্তি উৎপাদন করা। ইহা মহামায়া কর্ত্তৃক বিশ্বলীলা সৃষ্টির জন্য আহুত ও নির্ম্মিত। ইহার আবরণ এমন আশ্চর্য্য যে রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করিলেই ইহার আয়ত্তে বসবাস করিতে হইবে, ইহা অনিবার্য্য। গুরুকৃপা ব্যতীত ইহার আবরণ মোচন দুঃসাধ্য। আবরণ মোচন হইলেই আত্মদর্শন লাভ হইবে কিন্তু সে আবরণ হইতে পূর্ব্বকথিত আত্মসমর্পন ব্যতীত মুক্তিলাভ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব।

যখন উপলব্ধি হইবে যে এই জড়দেহাভ্যন্তরস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসও আমার নহে যখন বুঝিতে পারিবে যে এজগতে "আমার" বলিয়া নিজস্ব কিছুই নাই, এমন কি এ শ্বাস প্রশ্বাসটিও আমার নহে, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক মুহূর্ত্তও এ দেহে সে শ্বাস প্রশ্বাস অবস্থিত করিতে পারে না তখনই উপলব্ধি হইবে যে সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় "আত্মসমর্পন" আসিয়া পড়িবে।

এই সম্পর্কে একটা যুক্তি বা তর্ক উঠিতে পারে যে তবে কি সত্য সত্যই মনুষ্যের নিজের কোন ক্ষমতাই নাই? অর্থাৎ তর্ক উঠিতে পারে যে দৈব অধিক বলবান না পুরুষকার অধিক বলবান। অজপা সম্বন্ধে প্রবন্ধেতে এ প্রশ্নের মীমাংসার আবশ্যকতা তদ্রূপ নাই, তত্রাপি আত্মসমর্পণের সহিত দৈব পুরুষকার নিত্য জড়িত ও সংশ্লিষ্ট।

দৈব অর্থে "ঐশ্বরিক" বা "ভগবৎপ্রদত্ত" ইহাই সাধারণ চলিত কথায় আমরা বুঝি। আর "পুরুষকার" অর্থে আমাদের "স্বকীয় ক্ষমতায় বা উদ্যোগে লব্ধ" এই ভাব আমরা বুঝি। একের অভাবে অন্যের ক্ষমতা কতদূর ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

এই "পুরুষকার" বা স্বায় ক্ষমতার দ্বারা কর্ম্মসাধনে দৈব বা ঐশ্বরীক কৃপা ব্যতীত কতদূর কৃতকার্য্য আমরা হইতে পারি। এ তর্ক যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহার মিমাংসা হয় নাই। জগদীশ্বর আছেন কি নাই এই তর্ক যেমন সৃষ্টির আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে, ঠিক সেইরূপই দৈব প্রধান, কিংবা পুরুষকার প্রধান সে তর্কও চলিয়া আসিতেছে। আমরা সামান্য বুদ্ধিতে ইহা বুঝিতে পারি যে যখন এই "শ্বাস প্রশ্বাস" টুকু ও আমার নহে, ইহা পরম সত্য কথা তখন এই "পুরুষকার"ও দৈবশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার "কৃপা" ব্যতীত "পুরুষকার" একটা অর্থহীন, সারহীন ভাষার ঝঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। উভয়েই উভয়ের সাপেক্ষ। দৈবের সাধনায় পুরুষকার আবশ্যক, আবার পুরুষকার দ্বারা কর্ম্মসাধনায় দৈব বা ভগবৎ কৃপা আবশ্যক; নচেৎ সিদ্ধি সুদূর পরাহত।

এই আত্মসমর্পণ যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ বৈরাগ্য আসিবে না, ও বৈরাগ্য না আসিলে বিমল বিশুদ্ধ আনন্দ আসিবে না; অহৈতুকী প্রেমের স্ফুরণ হইবে না। যতক্ষণ ভালবাসা মায়ার আবরণে আচ্ছান্ন থাকিবে ততক্ষণ তাহা স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা বা মোহ, তাহাকে প্রেম বলা যায় না, প্রেম "অহৈতুকী", সেই প্রেমের স্ফুরণই "শান্তি", তাহা চিরস্থায়ী জন্ম জন্মান্তরের সাথী ও জীবের সুখলভ্য পদার্থ। এই "শান্তি" ভগবচ্চরণ ব্যতীত বিশ্বসংসারে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

সেইজন্যই আমাদের প্রেমের ঠাকুর, মানবের দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুঃখ মোচনার্থে নিষ্কামভাবে সদ্গুরুর শ্রীপাদপ্রান্তে জীবনব্যাপী সাধনা করেন ও শোক, তাপ, অভাব,

দারিদ্র্য, সর্ব্বপ্রকার অশান্তিজনক পীড়ার করকবল হইতে মুক্তির একমাত্র অমোঘ ঔষধ "অজপা" রূপ শান্তিবারি সেই করুণাময় সদ্‌গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া জীবকে বিলাই-তেছেন, ইহার "এক বিন্দু" পাইলেই জীব ধন্য হইয়া যাইবে।

অজপা বিশেষরূপে অভ্যাস বা করায়ত্ত হইলে অর্থাৎ অজপা সাধনার উচ্চস্তরে সাধক পৌঁছাইলেও, মা ব্রহ্মময়ী বা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপিণী সেই আদ্যাশক্তির দর্শন লাভ তখনও সুদূরপরাহত। সাধক অজপায় স্থিরভাবে নিবিষ্ট হইতে পারিলেও দেখিতে পাইবেন সেই অজপার চারিপাশ হইতে লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মায়াপ্রকটিত ষড়রিপু নূতন নূতন আকারে নূতন নূতন ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, ইচ্ছা, চঞ্চল মনকে নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার করায়ত্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ আধিপত্য বিস্তার করে। সুতরাং সাধক এ উচ্চাবস্থায় পৌঁছাইলেও সাধকের নিস্তার নাই। সেইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে সাধক উপলব্ধি করিবেন। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত শান্তির অবস্থা আসিতে পারে না। মনের ময়লা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ সমস্ত সাধনা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সাধকের মনে বার বার অশান্তির উৎপত্তি হইবে। ভরসা কেবল গুরুকৃপার উপর। গুরুকৃপা ব্যতীত কোন সাধনাই সিদ্ধ হইবার নহে। তিনি বলিয়াছেন যে এই অজপা সাধনাই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়। সুতরাং এই "অজপা যে স্বয়ং অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপিণী মা ব্রহ্মময়ীর শ্বাস" ইহা উপলব্ধি করিয়া মন্ত্রের বা নামের সংযোগে অভ্যাস করিতে করিতে সমস্ত ময়লা ক্রমশঃ পরিস্কার হইয়া যাইবে। যখন এই প্রেমের সহিত অজপা অহরহঃ অভ্যাস ও উপলব্ধি হইবে তখনই "তাঁহার" স্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হইবে। সাধক সেই অবস্থায় সাধনার চরমসীমায় উপনীত হইবেন ও পূর্ণানন্দে মগ্ন হইবেন। একবার সে আনন্দের আস্বাদ পাইলে, জীব তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। বার বার সেই আনন্দ উপভোগের তীব্র বাসনা জাগিবে ও সর্ব্বক্ষণ সেই পরমানন্দময়ী জগজ্জননীর পাদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইবে।

অজপা সম্বন্ধে আমার সামান্য যতটুকু উপলব্ধি হইয়াছে ততটুকু গুরুকৃপায় লিপিবদ্ধ করিলাম। উপরোক্ত অবস্থা আমার হয় নাই কখনও যে হইবে সে প্রত্যাশা হয় না, তবে গুরুকৃপায় সকলি সম্ভব হয়। কর্ম্মফল প্রপীড়িত জীব, একবার এ পথে আসিয়া দেখুন না কেন, তর্ক না করিয়া, সম্ভব, অসম্ভব বিচার না করিয়া, নিজ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ

না করিয়া, বিশ্বাস করিয়া অবসর মত এই অজপারূপ সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া একবার দেখুন না কেন, যে গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য সত্য কিনা।

শান্তি যদি চাহেন, তবে এই অজপায় লক্ষ্য রাখিতে অভ্যাস করুন। রূপজ, মোহজ বাসনায় কখনও শান্তি পাওয়া যায় নাই ও কখনও যাইবে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কখনও শান্তি পাইবেন না। সে কৃপার একবিন্দু পাইলেই জীব ধন্য। তখন আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে না, নিজে তাহার হিল্লোলে ডুবিয়া থাকিবেন ও সমস্ত জগতকে প্রেমবারি বিতরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

সাধনা পথে এ অধম আগন্তুক মাত্র, সাধনার উপযুক্ত কোন সদ্‌গুণই এ অধমের নাই তথাপি তাহার উপর তাহার শ্রীগুরুর কৃপা অসীম, মা ব্রহ্মময়ীর কৃপা অসীম। সন্তানের উপর মায়ের কৃপা সদাই প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে বর্ষণ হইতেছে, আবশ্যক কেবল তাহা উপলব্ধি করা, তাহা উপভোগ করা ও জীবনে মরণে সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী আনন্দময়ী মায়ের শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণা স্বরূপ একটু স্থান পাওয়া। তাহা কি এ অধমের ভাগ্যে মিলিবে প্রভু? সবই তোমার কৃপাধীন।

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

অলমতি বিস্তরেন।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

গুরুকৃপাপ্রার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রণাম

(তুমি) আছ বিশ্বভরি, আমি ত না হেরি
অন্ধ এ দুটি আঁখি গো।
(বসি) উষার আলোকে, হৃদয় ফলকে,
তোমার মূরতি আঁকি গো॥

কর্ম্ম সমাপনে, বসি নিরজনে,
হেরিব তোমায় আমি গো।
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বার বার পদে নমি গো॥

নাহি যোগবল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
নাহি জানি স্তব স্তুতি গো।
নাহি তন্ত্র মন্ত্র আদি, বেদশাস্ত্র বিধি,
আমি যে মূরখ অতি গো॥

নাহি গঙ্গাজল, তুলসীর দল,
কি দিয়া ক'রব পূজা গো।
আমার সম্বল শুধু আঁখিজল,
লহ হৃদয়ের রাজা গো॥

সমাপ্ত।

গানের সূচীপত্র।

